ভগবৎ-দর্শন

হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি **শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ** আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতন গোপাল দাস ● **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● **অনুবাদক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● **প্রুফ সংশোধক** সুধাম নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস ● **প্রবন্ধক** জয়ন্ত চৌধুরী ● **প্রচ্ছদ/ডিটিপি** শ্রবণ ধারা ● **হিসাব রক্ষক** বিদ্যাধর দাস ● **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ও ব্রজেশ্বর মাধব দাস ● **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস ● **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **সত্যদর্শী নন্দা** দ্বারা প্রকাশিত ● **অফিস** অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা-৭০০০১৯, মোবাইলঃ ৯০৭৩৭৯১২৩৭, মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোস্ট)** ১ বছরের জন্য - ২০০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৪০০ টাকা, ৩ বছরের জন্য - ৫৭০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিস্ট্রি পোস্ট)** ১ বছরের জন্য - ৪৩০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(ক্যুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য - ৩৮০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৬০০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) ● **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।**

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০১৮ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

৪২ বর্ষ ▪ ১০ম সংখ্যা ▪ নারায়ণ ৫৩২ ▪ ডিসেম্বর ২০১৮

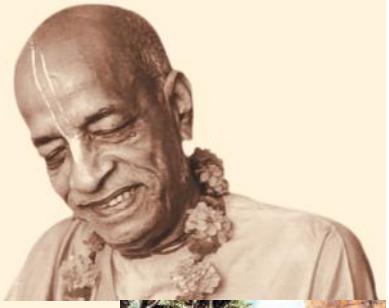

বিষয়-সূচী

৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী
প্রাকৃতিক জীবনধারাকে ভালবাসতে শিখুন
ভগবানের প্রতি আত্মনিবেদন কর, চিরজীবি হও। এই হলো সঠিক পথ। এটি অনুসরণ কর। তুমি চিরজীবি হবে। তোমার প্রক্রিয়ায়, ত্যক্তদেহং পুনর্জন্ম নৈতি। বর্তমানে জড়দেহকে পরিত্যাগ করার পর তুমি অন্যকোন জড়দেহ পাবে না। তুমি পুনরায় তোমার চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হবে এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে

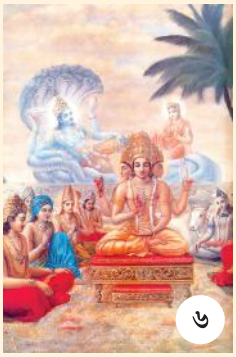

১০ আদর্শ জীবন
ভগবদ্গীতার সাতটি অনবদ্য বৈশিষ্ট্য
ভগবদ্গীতা হচ্ছে এক অপ্রাকৃত সাহিত্য, যা অতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। ভগবদ্গীতার নির্দেশকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারলে, অতি সহজেই সমস্ত ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

২১ আচার্য বাণী
মহাজন কথা (ভীষ্মদেব)
ভগবান বলেছেন, 'মৃত্যুর সময় যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমারই ভাব প্রাপ্ত হন।' শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গে তাঁর শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্যে লিখেছেন— 'মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভীষ্মদেবের মতো মৃত্যুবরণ করা।'

২৭ পরিচয়
ব্রজধাম দর্শন
বিমলাকুণ্ড দর্শন, কুণ্ডে স্নান, কুণ্ডের পূজা, জলপান করলে মেরুতুল্য পাপ ছেদন করে মানুষ গোলোকধামে গমন করে। বিমলাকুণ্ডের চতুর্দিকে বহু মন্দির ও অত্যন্ত মনোরম স্থান।

৬ প্রচ্ছদ কাহিনী
চেতনার বিকাশ
একজন প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেইজন্য প্রকৃত উপভোগের সন্ধান করেন। যদি এইরূপ ব্যক্তি আন্তরিক এবং ভাগ্যবান হন, তিনি এক যথার্থ আধ্যাত্মিক গুরুর সংস্পর্শে আসেন যাঁর কৃপায় তিনি প্রকৃত ভোগের সন্ধান পান।

প্রবন্ধ

১৫ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা
শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, দাবানল আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে ঠিক তেমনি সংসারে আপনা থেকেই ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত শ্রীকৃষ্ণের চরণের শরণাগত হওয়া।

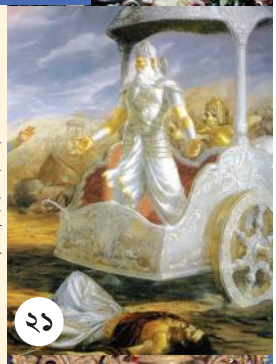

৩১ আদর্শ জীবন
নির্বিশেষ শূণ্যবাদী
পূর্ণতম সত্যকে বৈদিক শাস্ত্রে একজন ব্যক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে — যিনি হচ্ছেন ভগবান। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে সেই ব্যক্তিকে কৃষ্ণ নামে ব্যক্ত করা হয়েছে। কৃষ্ণ এক হয়েও অসীমরূপে নিজেকে বিস্তার করতে পারেন।

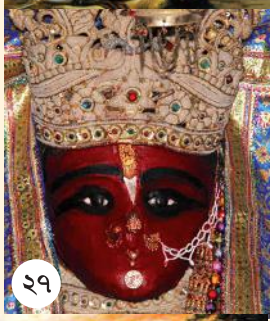

বিভাগ

৯ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর
বহু পুণ্যফলে মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। তা হলে কলিযুগে কি পুণ্যবান বেশী?

১৩ ইসকন সমাচার
ইসকনের আন্তর্জাতিক অবদানকে স্বীকৃতি

১৮ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ
ভেজিটেবল চপ

১৯ ছোটদের আসর
সাঁতারু ইঁদুর ও লম্ফমান ব্যাঙ

২৫ ভক্তি কবিতা
শ্রীভাগবত-অষ্টকম্

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

সম্পাদকীয়

ভক্তের কি তার কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করা উচিত?

অর্জুন যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পলায়ন করতে চেয়েছিলেন, কৃষ্ণ তাকে এই রূপ করতে নিষেধ করেছিলেন। যখন অর্জুন সর্বস্ব ত্যাগ করে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছিলেন তখন কৃষ্ণ বলেছিলেন তোমার স্বধর্ম ত্যাগ করো না। যখন অর্জুন আবেগ তাড়িত হয়ে তার গান্ডীব উত্তোলনেও কম্পিত হয়েছিলেন, কৃষ্ণ কিন্তু সন্তুষ্ট হননি, কেন? কারণ কৃষ্ণ চেয়েছিলেন অর্জুন নিষ্ঠা এবং সংকল্পের সাথে তার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করুক।

অর্জুনের মতো অনেক সময় আমরা যারা কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনে রত আছি (অথবা ন্যুনতম অনুশীলনের প্রয়াস করছি) তারা এই অনুশীলন ক্ষেত্র থেকে পলায়নের প্রয়াস করি এই যুক্তিতে যে, এই অনুশীলন আমাদেরকে জড়জগতে আবদ্ধ করে রাখবে। কিন্তু আমরা কিভাবে নিশ্চিত হব যে, আমাদের নিস্ক্রিয়তা আমাদেরকে এই জড় জগতে আবদ্ধ করে রাখবে না? শাস্ত্র কখনোই আমাদের শাস্ত্রানুগ কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করতে বলেনি। আমরা যদি মহান আচার্যদের জীবন সম্বন্ধে অধ্যয়ন করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে, তারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে চরম পরিশ্রম করেছেন এবং পেশাগতভাবে নিপুণ ছিলেন। কেউ সন্ন্যাসী হতে পারেন অথবা গৃহী, স্ত্রী অথবা পুরুষ প্রত্যেককেই কর্ম করতে হবে। জড়বাদীরাও কঠিন পরিশ্রম করে এবং ভক্তরাও কঠিন পরিশ্রম করেন।

তফাৎ হচ্ছে এই যে, জড়বাদীরা তাদের নিজ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য পরিশ্রম করে যথা, নাম, যশ, অর্থ, ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি। কিন্তু একজন ভক্ত কঠিন পরিশ্রম করে কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য। সে যা কিছু অর্জন করে তা সে কৃষ্ণকে অর্পন করে। একজন ভক্ত সর্বোত্তম প্রয়াসের চেষ্টা করে এবং সফলতা বা বিফলতার চিন্তাই করে না। সে শুধু জানে যে, তার ঐকান্তিক প্রয়াস কৃষ্ণকে সুখী করবে এবং সে ফলের আশাও করে না। অপরপক্ষে জড়বাদীরা যখন তার পরিশ্রম হেতু কাঙ্ক্ষিত ফল না পায় তখন সে বিষাদগ্রস্ত হয় এবং আরও অধিকভাবে এই জড়জগতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একজন হাইকোর্ট জজ ছিলেন এবং তিনি এত দক্ষ ছিলেন যে, যখন তিনি কর্ম থেকে অবসর নিতে চেয়েছিলেন সরকার সেটি না করতে অনুরোধ করেন। প্রকৃতপক্ষে সরকার যখন দেখলেন তাঁর গৃহ ন্যায়ালয় হতে দুরে অবস্থিত এবং সেই কারণে তার কর্মক্ষেত্রে আসা যাওয়া কঠিন তখন তাঁর বাড়ী হতে কর্মক্ষেত্র পর্যন্ত একটি রেলওয়ে লাইন পাতা হলো। কারণ সরকার তাঁর মতো একজন সুদক্ষ পেশাদারকে হারাতে চায়নি। তিনি তার সমস্ত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শিক্ষা অনুশীলন এবং প্রচার করেছিলেন। তিনি একটি মানদন্ড তৈরী করেছিলেন, যা আমাদের প্রত্যেকের অনুসরণ করা উচিত।

অনেক ক্ষেত্রে আমি লক্ষ্য করেছি যে, আমরা ভক্তি জীবন অনুশীলনের নামে আমাদের পেশাগত কর্তব্য এবং পারিবারিক দায়িত্ব পালনে নিস্ক্রিয় হয়ে পড়ি। এটি শুধুমাত্র আমাদের প্রতি নয় সমগ্র কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রতি এক নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করে এবং যেহেতু কৃষ্ণ এটা চান না যে, আমরা এমনটা করি তাই এটি আমাদের ভক্তিজীবনকেও প্রভাবিত করে।

তাই একজন ভক্তের এটি করাই আবশ্যক যে, সে যখন নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তিজীবন অনুশীলন করছে পাশাপাশি এই জাগতিক কর্তব্য কর্মও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করুন। এই প্রয়াস আমাদের স্থায়ী ভক্তিজীবন প্রদান করবে এবং সুখী প্রগতিশীল কৃষ্ণভাবনাময় সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

২৪ জুন ১৯৭৬, নববৃন্দাবন, পশ্চিম ভার্জিনিয়া, আমেরিকা।

প্রাকৃতিক জীবনধারাকে ভালবাসতে শিখুন

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

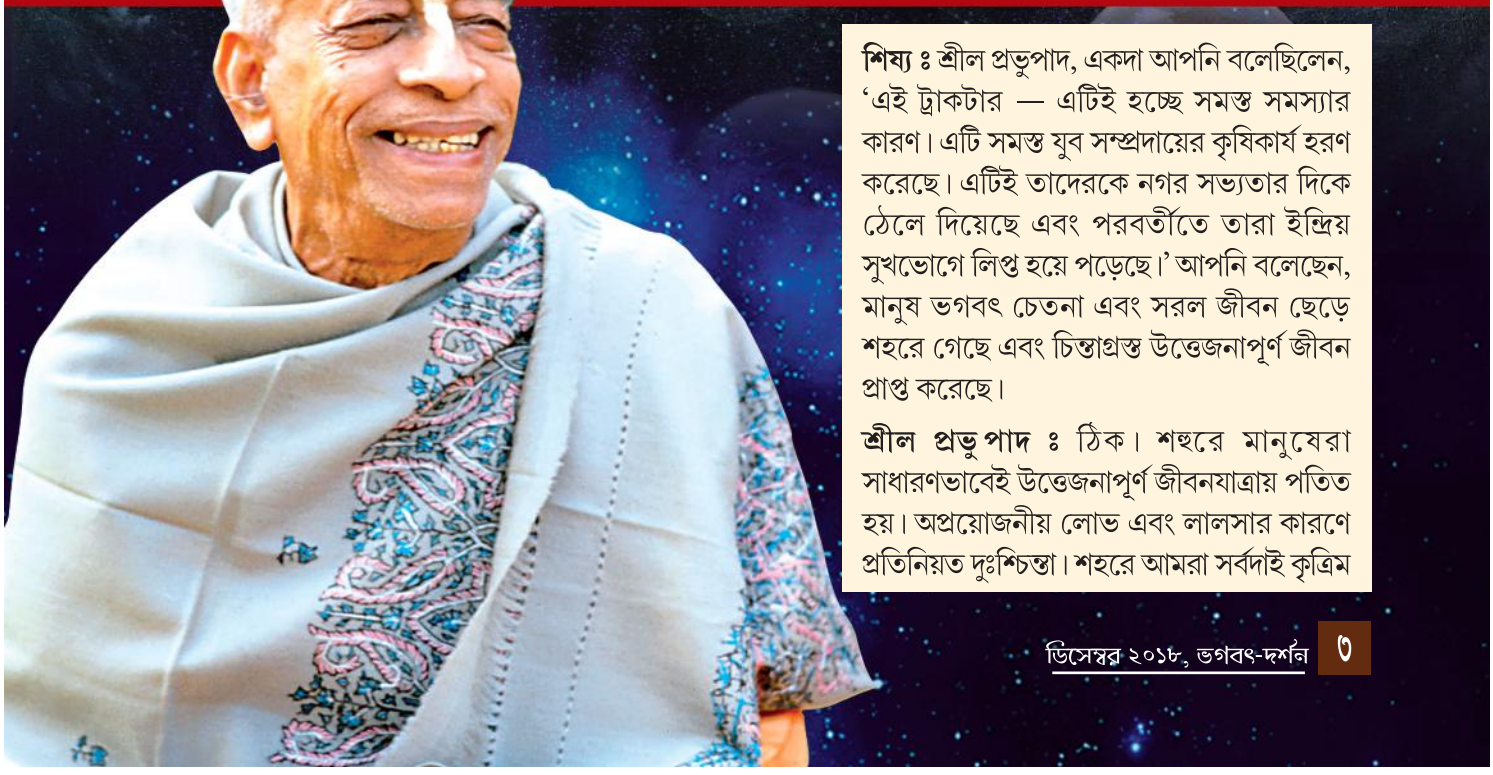

শিষ্য ঃ শ্রীল প্রভুপাদ, একদা আপনি বলেছিলেন, 'এই ট্রাকটার — এটিই হচ্ছে সমস্ত সমস্যার কারণ। এটি সমস্ত যুব সম্প্রদায়ের কৃষিকার্য হরণ করেছে। এটিই তাদেরকে নগর সভ্যতার দিকে ঠেলে দিয়েছে এবং পরবর্তীতে তারা ইন্দ্রিয় সুখভোগে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।' আপনি বলেছেন, মানুষ ভগবৎ চেতনা এবং সরল জীবন ছেড়ে শহরে গেছে এবং চিন্তাগ্রস্ত উত্তেজনাপূর্ণ জীবন প্রাপ্ত করেছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ ঠিক। শহরে মানুষেরা সাধারণভাবেই উত্তেজনাপূর্ণ জীবনযাত্রায় পতিত হয়। অপ্রয়োজনীয় লোভ এবং লালসার কারণে প্রতিনিয়ত দুঃশ্চিন্তা। শহরে আমরা সর্বদাই কৃত্রিম

বস্তু যা আমাদের মন এবং চেতনাকে উত্তেজিত করতে পারে তার দ্বারা বেষ্টিত থাকি। সাধারণভাবেই তাই যখন এই সুবিধাগুলি সুলভ থাকে আমরা লোভাতুর হয়ে পড়ি। আমরা এই উত্তেজনার ভাবাবেগকে গ্রহণ করি এবং দুশ্চিন্তায় পরিপূর্ণ হয়ে যাই।

শিষ্য ঃ গ্রাম্য জীবন অধিক শান্তিপূর্ণ। এখানে পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করা সহজ।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ ঠিক। সেখানে অসুখ নগন্য। মস্তিষ্কের পরিশ্রমও কম। গ্রামে বস্তুবাদী জীবনের যন্ত্রণাও কম। সুতরাং প্রকৃত লাভের জন্য তুমি তোমার জীবনকে ব্যবস্থিত করতে পারবে। আধ্যাত্মিক লাভ। ভগবৎ উপলব্ধি; কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠা। যদি তোমার গৃহে অথবা গৃহের নিকটে একটি মন্দির পাও তাহলে তোমার জীবন অত্যন্ত আনন্দময় হবে। তোমার কাজ স্বল্প — শুধুমাত্র তোমার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য — বসন্তে দেড়মাস কৃষিকাজ পরবর্তীতে দেড়মাস ফসল তোলা। অবশিষ্ট সময়ে তুমি সাংস্কৃতিক দিকে ধনী হয়ে উঠবে। তোমার সকল মেধা, দক্ষতা এবং শক্তিকে তুমি ভগবৎ উপলব্ধির কাজে নিয়োজিত করতে পারবে। কৃষ্ণভাবনার এই হলো আদর্শ জীবন।

ফুলের এই সূক্ষ্ম তন্তুগুলি দেখছ? এই পৃথিবীর কোন উৎপাদক প্রক্রিয়া এটি সৃষ্টিতে সক্ষম নয় — এত সূক্ষ্ম তন্তু। কত উজ্জ্বল এর রঙ! যদি তুমি একটি ফুল দেখ তুমি ভগবৎচেতনা প্রাপ্ত হবে। একটি প্রক্রিয়া আছে যাকে আমরা 'প্রকৃতি' বলি। আমরা চারিদিকে যা দেখি সমস্ত কিছু এর থেকেই উৎপন্ন হয়। এখন প্রশ্ন এই প্রক্রিয়া কিভাবে এত নিখুঁত? কে এই প্রক্রিয়ার স্রষ্টা?

শিষ্য ঃ একবার লণ্ডনে আপনি বলেছিলেন, 'মানুষ জানে না যে, ফুলগুলি রঙ করা হয়েছে। কৃষ্ণ চিন্তা দিয়ে তাদের রঙ করেছেন।'

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। অধিকাংশ মানুষ ভাবে কোন চিত্রকর ছাড়াই ফুলেরা আপনা আপনিই সুন্দর হয়েছে। এটি মূর্খতা। 'প্রকৃতি তৈরী করেছে।' প্রকৃতি কার? সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট — পরাস্যশক্তির্বিভিধৈব সূয়তেঃ ভগবান তাঁর অনন্ত অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা সব সৃষ্টি করছেন।

যাই হোক, জীবনের সাত্বিক গুণকে ভালোবাসতে শেখ, উন্মুক্ত পরিবেশের জীবন। নিজের খাদ্যশস্য নিজে উৎপন্ন কর। দুগ্ধ নিজে উৎপাদন কর। সময় বাঁচাও। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কর। ভগবানের দিব্যনামের মহিমা কীর্তন কর। জীবনশেষে চিরদিনের জন্যে ভগবৎধামে প্রত্যাবর্তন কর। সরল জীবন, উচ্চ চিন্তা — আদর্শ জীবন।

আধুনিক, কৃত্রিম জীবনের প্রয়োজনীয়তা আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তোমার তথাকথিত আরাম বর্ধিত করছে। কিন্তু যদি তুমি জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ভুলে যাও সেটি হবে আত্মঘাতী। আমরা এই আত্মঘাতী প্রক্রিয়াকে বন্ধ করতে চাই। আমরা প্রত্যক্ষভাবে প্রযুক্তির এই আধুনিক অগ্রগতিকে বন্ধ করার প্রচেষ্টা করতে পারি না। প্রযুক্তির এই তথাকথিত অগ্রগতি হলো আত্মঘাতী, কিন্তু আমরা সর্বদা এই সম্বন্ধে আলোচনা করি না। (হাস্য) বর্তমানে মানুষ প্রযুক্তির এই তথাকথিত অগ্রগতির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। সেইজন্য পাঁচশত বৎসর

পূর্বে যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন তিনি এক সরল সূত্র প্রদান করেন — হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ। এমনকি তোমার প্রযুক্তির কারখানাতেও তুমি জপ করতে পার। তুমি মেশিনে কাজ করা কালীন জপ করতে পার, 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ ...'। তুমি ভগবানের কাছে নিজেকে সমর্পন করতে পার। এখানে ভুল কোথায়?

শিষ্য ঃ নেতারা জানেন, যে মুহূর্তে এক ব্যক্তি ভগবানের নাম জপ করতে শুরু করে ধীরে ধীরে প্রযুক্তির এই উদ্বেগময় জীবনের প্রতি সে অনাসক্ত হয়ে পড়ে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এটি স্বাভাবিক।

শিষ্য ঃ সুতরাং নেতারা জানেন, আপনি ধ্বংসের বীজ বপন করছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ 'ধ্বংস' কোথায়? বরং এই হলো গঠন ঃ ভগবানের প্রতি আত্মনিবেদন কর, চিরজীবি হও। এই হলো সঠিক পথ। এটি অনুসরণ কর। তুমি চিরজীবি হবে। তোমার প্রক্রিয়ায়, ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি। বর্তমানে জড়দেহকে পরিত্যাগ করার পর তুমি অন্যকোন জড়দেহ পাবে না। তুমি পুনরায় তোমার চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হবে এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে। এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ব্যতীত, তথা দেহান্তর প্রাপ্তিঃ যখন তুমি তোমার বর্তমান জড়দেহ পরিত্যাগ করবে, তোমাকে পুনরায় আরেকটি জড়দেহ গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং দুই ধরনের জীবনযাত্রার তুলনা কর। কোন্‌টি উত্তম? অগ্রগতির পথ — আরও জড়দেহ গ্রহণ অথবা আমাদের প্রাচীন পন্থা আর জড়দেহ গ্রহণ না করা। কোন্‌টি উত্তম?

যে মুহূর্তে তুমি জড়দেহ গ্রহণ করবে, তোমাকে যাতনা পেতে হবে— জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি। জড়দেহের অর্থ যন্ত্রণা। সেইজন্য এই বর্তমান দেহত্যাগের পূর্বে যদি আমরা প্রস্তুত হই যেন আর যন্ত্রণা না পাই, সেইটিই বুদ্ধিমত্তা। কিন্তু যদি আমরা আরও যন্ত্রণা প্রাপ্তির জন্য অপর জড়দেহ গ্রহণ করার প্রস্তুতি নিই, সেটি কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয়? যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ভগবানকে, শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে না পারছ, তোমাকে অপর দেহ গ্রহণ করে এই জড়জগতে বাস করতে হবে। এর বিকল্প নেই।

ভগবানের প্রতি আত্মনিবেদন কর, চিরজীবি হও। এই হলো সঠিক পথ। এটি অনুসরণ কর। তুমি চিরজীবি হবে। তোমার প্রক্রিয়ায়, ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি। বর্তমানে জড়দেহকে পরিত্যাগ করার পর তুমি অন্যকোন জড়দেহ পাবে না। তুমি পুনরায় তোমার চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হবে এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে।

বর্তমানে আমাদের প্রক্রিয়া আমরা প্রথমে উপলব্ধি করি যে, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরেঃ যখন দেহের অন্ত হয়, আত্মা জীবিত থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক মানুষ এত স্থূল মস্তিষ্ক হয় যে, তারা এই সরল সত্যকে অনুধাবন করতে অক্ষম। জীবনের প্রতিদিনে মানুষ দেখে যে, শিশুদেহের আত্মা ধীরে বালকদেহ ধারণ করে। তারপর কৈশোর দেহ, অতঃপর প্রাপ্তবয়স্ক দেহ এবং বৃদ্ধদেহ ধারণ করে। মানুষ নিজের চোখে দেখে কিভাবে আত্মা একদেহ থেকে অন্যদেহে দেহান্তরিত হচ্ছে। তবুও তাদের স্থূল মস্তিষ্কে তারা বুঝতে পারে না যে, মৃত্যুতে যখন বৃদ্ধদেহের অন্ত হয় আত্মা তারপর চিন্ময় অথবা জড়দেহ পুনরায় গ্রহণ করে। কিন্তু মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের মস্তিষ্ক এত স্থূল। তারা দেহ এবং আত্মার মধ্যে সরল পার্থক্যটি নিরূপণ করতে পারে না। এই সরল সত্যটি তাদের শেখাতে আরও পাঁচশ বছর লাগবে — তাদের শিক্ষা এত উন্নত!

চেতনার বিকাশ

শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ

মানুষের হাতে আধ্যাত্মিক বিকাশের মাধ্যমে ভগবৎ প্রেমের সর্বোচ্চ স্তরে নিজেকে উত্তোলন করার অনন্য সুযোগ রয়েছে।

বৈদিক শাস্ত্রে চেতনাকে আচ্ছাদিত, সঙ্কুচিত, মুকুলিত, বিকশিত এবং পূর্ণ বিকশিত নামে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বৃক্ষ এবং গুল্মলতা সকল প্রায় জড়। তারা 'আচ্ছাদিত চেতনে'র অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্যে সাধারণত কোন চেতনা প্রত্যক্ষ করা যায় না কিন্তু যখন আমরা তাদের যত্ন নিয়ে পর্যবেক্ষণ করি, আমরা তাদের মধ্যে সীমিত চেতনা দেখতে পাই।

অন্য জীবাত্মা সকল যেমন কীট, পতঙ্গ এবং অন্যান্য প্রাণীরা 'সঙ্কুচিত চেতনা'র অন্তর্ভুক্ত। তাদের চেতনা গুল্মের মতো আচ্ছাদিত নয় কিন্তু পূর্ণমাত্রায় উন্নতও নয়।

মানব চেতনা হলো 'মুকুলিত চেতন'। একটি মুকুল প্রথমে সঙ্কুচিত দেখালেও তার মধ্যে বিকশিত পুষ্পে পরিণত হওয়ার শক্তি রয়েছে। মানব চেতনারও অনুরূপ শক্তি রয়েছে; এটিকে অন্য প্রাণীর মতো সঙ্কুচিত দেখালেও মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলে সেই চেতনার অসীম উন্নতি হতে পারে, এমন কি পরম সত্য, পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে।

অন্যান্য জীবাত্মার এই বিশেষ ক্ষমতা নেই। সেইজন্য বৈদিক শাস্ত্রে মানবজীবনকে উন্নততম বলে অভিহিত করা হয়েছে। অবশ্য সকল শাস্ত্রই মানবজীবনকে বিশেষ পবিত্র বলে অভিহিত করেছে।

যখন এক ব্যক্তি আন্তরিকভাবে পরম সত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে সচেষ্ট হয়, তার মুকুলিত আধ্যাত্মিক চেতনা বিকশিত হয়ে উন্নততর হতে শুরু করে। সেটিই হলো 'বিকশিত চেতন' স্তর। তার অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ যখন সে অবশ্য পালনীয় আধ্যাত্মিক আচরণগুলি পালন করতে শুরু করে তখন সে আরও বিকশিত হয়। অবশেষে সে পূর্ণ ভগবৎ উপলব্ধি, 'পূর্ণ বিকশিত চেতন' প্রাপ্ত হয়।

ভগবৎ উপলব্ধি সম্ভব কারণ একটি জীবাত্মার প্রকৃত সত্তা হলো আত্মা, জড়দেহ নয়। আত্মা চিৎজগত থেকে আসে; এটি জড়জগতে হয় না। যখন আত্মা চেতনার নিম্নস্তরে পতিত হয়, প্রথমে এটি মন, বুদ্ধি এবং অহংকার রূপ এক সূক্ষ্ম দিব্য জড়দেহ দ্বারা আবৃত হয়। তারপর ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম দ্বারা গঠিত এক স্থূল জড়দেহ দ্বারা আবৃত হয়।

আমাদের জড়চক্ষু দ্বারা যা কিছু আমরা দেখি সে সবই স্থূল জড় বস্তু। স্থূলদেহের ভিতর যে সূক্ষ্মদেহ অবস্থান করে তাকে আমরা চোখে দেখতে না পেলেও আমাদের বুদ্ধির দ্বারা অনুভব করতে পারি।

মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কারের মতো সূক্ষ্মদেহের থেকেও সূক্ষ্মতর হলো আত্মা যা দেহকে চেতনা প্রদান করে। এই আত্মা হলো চেতনার উৎস এবং দেহে প্রাণের উৎস। এই আত্মাই 'আমি'। যতক্ষণ পর্যন্ত দেহে আত্মা অবস্থান করে, দেহ প্রাণময় থাকে, দেহের ভিতর চেতনাশক্তি প্রবাহিত হয় এবং আচ্ছাদিত আত্মা দেহকে আমি বলে ভুল করে।

পূর্ব কর্মফল অনুযায়ী আত্মার এক দেহ থেকে অন্য দেহে দেহান্তর হয়। মন অথবা সূক্ষ্মদেহে তার প্রতিটি কর্মের চিহ্ন থাকে এবং সেই অনুসারে সূক্ষ্মদেহ আকার ধারণ করে।

উদাহরণ স্বরূপ যদি কেউ দেবদূতের মতো কাজ করে, তার সূক্ষ্মদেহ দেবদূতের মতো হয়। যদি কেউ শূকরের মতো কার্য করে তার সূক্ষ্মদেহ শূকরের মতো হয়। মৃত্যুকালে যখন আত্মা স্থূলদেহ ত্যাগ করে, সূক্ষ্মদেহ তখন আত্মাকে বহন করে সূক্ষ্মদেহের আকারের অনুরূপ সুনির্দিষ্ট গর্ভে নিয়ে যায়। এইরূপ উদ্ভূত চেতনা অনুসারে আত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে দেহান্তরিত হয়।

বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, আশি লক্ষ নিম্ন যোনি অতিক্রম করে একজন মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়। ক্রমান্বয়ে প্রতিটি পতিত আত্মা আচ্ছাদিত, সঙ্কুচিত এবং মুকুলিত প্রভৃতি চেতনার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে বিকাশ লাভ করে। মুকুলিত স্তরে দেহাভ্যন্তরস্থিত আত্মা সর্বোচ্চ চেতনাসম্পন্ন ভগবানের সঙ্গে তার সম্বন্ধ জাগরিত করে তার আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটানোর সুযোগ লাভ করে। যদি সে এই সুযোগের অবহেলা করে, তাহলে তাকে পুনরায় আচ্ছাদিত, সঙ্কুচিত এবং মুকুলিত স্তরের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করতে হবে।

মনুষ্যেতর প্রাণী সকল দেহগত চেতনায় নিমজ্জিত থাকে। কখনও কখনও মানুষেরাও এমন করে কিন্তু মানুষ নিজেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করতে সক্ষম। মানুষ এবং পশুর মধ্যে এই হলো প্রধান পার্থক্য। যদি একজন মানুষ উচ্চগুণসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও পশুর মতো শুধুমাত্র আহার, নিদ্রা, মৈথুন এবং আত্মরক্ষাতেই রত থাকে তাহলে সে এই আশ্চর্য গুণের অপব্যবহার করছে। সে এক বিরল সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছে।

একজন মানুষ তার উন্নত বুদ্ধিমত্তার কারণে নির্বাচনের সুযোগ প্রাপ্ত হয়, জড়চেতনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে পারমার্থিক উন্নতিসাধন অথবা পুনরায় নিম্ন চেতনায় নিম্ন স্তরে গমন। স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ প্রায়শই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই জীবনের লক্ষ্যরূপে গণ্য করে এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনকারী বস্তুপ্রাপ্তির জন্য সারা জীবন যুদ্ধ করে জীবনের অপব্যবহার করে। জড়জাগতিক উচ্চ লক্ষ্যে নিমগ্ন হয়ে ভুলক্রমে তারা নিম্নচেতনাকে নির্বাচন করে।

বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ দেহগত বিলাসের জন্য এইপ্রকার প্রচেষ্টার নিস্ফলতা অনুধাবন করতে পারেন। তারা অনুভব করেন যে, জড়জগতের সব কিছুই অনিত্য। সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করেন যে, উপভোগ করার সকল প্রচেষ্টারই দাসত্ব এবং দুঃখে পরিসমাপ্তি ঘটে। সেই জন্য অতীতের সকল মহান চিন্তাবিদই জড় সুখ ভোগের বিপক্ষে ছিলেন।

কিন্তু এই বিরূপতাই যথেষ্ট নয়। একজন জড় সুখ ভোগের বিপক্ষে থেকে পৃথিবীকে অস্বীকার করতেই পারেন কিন্তু উপভোগের ইচ্ছা স্বাভাবিক। কারণ আত্মা পরমভোক্তা, শ্রীকৃষ্ণের চেতনার সূক্ষ্মকণাসদৃশ অংশ হওয়ায় তাঁর সকল গুণেরই স্বল্পঅংশ আত্মার মধ্যে আছে; সুতরাং ভোগের জন্য ইচ্ছা আত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আত্মাকে উপলব্ধি করতে হলে এত উপলব্ধি করতে হবে যে, আমরা পরিপূর্ণভাবে আমাদের ভোগের ইচ্ছাকে দমন বা ত্যাগ করতে পারি না।

একজন প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেইজন্য প্রকৃত উপভোগের সন্ধান করেন। যদি এইরূপ ব্যক্তি আন্তরিক এবং ভাগ্যবান হন, তিনি এক যথার্থ আধ্যাত্মিক গুরুর সংস্পর্শে আসেন যাঁর কৃপায় তিনি প্রকৃত ভোগের সন্ধান পান।

একজন প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেইজন্য প্রকৃত উপভোগের সন্ধান করেন। যদি এইরূপ ব্যক্তি আন্তরিক এবং ভাগ্যবান হন, তিনি এক যথার্থ আধ্যাত্মিক গুরুর সংস্পর্শে আসেন যাঁর কৃপায় তিনি প্রকৃত ভোগের সন্ধান পান। আধ্যাত্মিক গুরুর তত্ত্বাবধানে তিনি ভগবানের সঙ্গে তার দীর্ঘ বিচ্ছিন্ন সম্বন্ধের পুনস্থাপন করার সুযোগ পান।

ভগবানের প্রতি আত্মার সুপ্ত প্রেমের জাগরণ অবশ্য প্রয়োজনীয় কারণ ভগবানের স্ফুলিঙ্গ সদৃশ অংশ রূপ আত্মা তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে না পারলে কখনোই সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয় না। বৈদিক শাস্ত্রের এই হলো মূল বাণী।

বৈদিক শাস্ত্রসমূহ আমাদের এই উপদেশ প্রদান করে যে, যদি আমরা জড় বস্তু উপভোগ করতে চাই সেক্ষেত্রে ইচ্ছাপূরণের জন্য স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা না করে এই ইচ্ছাপূরণের জন্য ভগবানের উদ্দেশ্যে আমাদের ভক্তিপূর্ণ সেবা ও প্রার্থনা করা উচিত। এটি শুদ্ধ ভক্তি নয় কিন্তু অন্ততপক্ষে এক্ষেত্রে ভগবানকে সর্বোচ্চ অধীশ্বর রূপে গণ্য করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই যে এই উপলব্ধি নিয়ে বড় হয়, সে প্রকৃত মালিককে সবকিছু নিবেদন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এইরূপ নিবেদনই ভগবানের প্রতি ভক্তিপূর্ণ সেবার সূচনা করে।

ভক্তি শব্দটির দ্বারা এক তীব্র সম্মোহিত ভালোবাসাকে

বোঝায়। আমাদের কাছে যা কিছু মূল্যবান এবং সুন্দর তা ভগবানের কাছে নিবেদনের মাধ্যমে আমরা এই প্রেমের অভিজ্ঞতা লাভ করি। এক যুবক এবং যুবতীর প্রেমের তীব্রতা আমরা জানি কিন্তু ভগবানের প্রতি আমাদের ভালোবাসা কতবার সেই উচ্চ তীব্রতার স্তরে পৌছায়? তথাপি এক পুরুষ ও নারীর প্রেম শুধুমাত্র ভগবানের প্রতি প্রত্যেক আত্মার প্রকৃত ভালোবাসার এক বিকৃত প্রতিফলন।

জড় প্রকৃতি প্রকৃতপক্ষে চিন্ময়জগতের এক বিকৃত প্রতিফলন। এটি স্বপ্নের মতো, মায়া। একমাত্র পার্থক্য এই যে, স্বপ্ন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিন্তু এই স্বপ্নরূপ জড় প্রকৃতি হলো সামূহিক অভিজ্ঞতা। তথাকথিত এই সত্যের পরপারে যে পরম সত্য রয়েছে তা হলো এই বিকৃত প্রতিফলনের ভিত্তি। যখন আমাদের চেতনা বিকশিত হয় এবং আমরা জড়দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হই তখন ভগবানের সাথে আমাদের এক ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারপর আমরা সেই সত্যে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হই যেখানে প্রকৃত ভোগ সর্বদা উপস্থিত থাকে।

এই জড়জগতে প্রকৃত আনন্দ নেই। এটি শুধুই বিভ্রম। আনন্দ আছে ভেবে আমরা তার পিছনে ছুটি, সেটি আমাদের থেকে দূরে চলে যায়। সেইজন্য বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর অর্থে প্রত্যেকেই জড়জীবনের প্রতি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে; আমাদের হৃদয়ের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। এই অবসন্নতার কারণ হলো আমরা চিন্ময়, জড় নই।

আমাদের ভোগের ইচ্ছাও চিন্ময় কিন্তু আমাদের চিন্ময় প্রকৃতির কথা ভুলে আমরা জড়জগতে ভোগের সন্ধান করি। আমরা জড়দেহকে স্বরূপ ভেবে জড়বস্তু ভোগের চেষ্টা করি কিন্তু পারি না। স্বভাবতই আমরা অবসাদগ্রস্ত হই। যদি তুমি একটি মাছকে জল থেকে তুলে স্থলের সকল আরাম দিতে চাও, সেটি কি সুখী হবে? অনুরূপভাবে আমরাও আধ্যাত্মিক প্রকৃতি। জড়ভোগে আমরা কখনোই প্রকৃত অর্থে সুখী হতে পারি না।

আধুনিক যুগে আমরা অনেক বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি করেছি, কিন্তু পরিশেষে তা মানুষকে অধিক বিহ্বল করেছে। মানুষ আরও অধিকমাত্রায় নাস্তিক হয়ে মিথ্যা আশার ছলনে আরও জড়বাদী হয়েছে যে, বিজ্ঞান আমাদের সুখের সন্ধানের উত্তর দেবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখি যে, অর্থনৈতিক উন্নতি, সামাজিক সুরক্ষার অনুষ্ঠান ইত্যাদি সত্ত্বেও আত্মহত্যা, স্বজনহত্যা, ধর্ষণ, ভ্রূণহত্যা এবং অন্যান্য অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি অবশ্যই অসুখী সমাজের লক্ষণ।

যদি কেউ প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করতে চায়, তাকে অবশ্যই আধ্যাত্মিক চেতনার উন্নতিসাধন করতে হবে যা পরিশেষে ভগবৎ প্রেমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে। সেইজন্য সকল ধর্মই আমাদের সকল প্রয়োজনে আমাদের ভগবানের নাম করে প্রার্থনা করতে শিক্ষা দেয় যাতে আমরা তাঁর চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে পারি। সকল শাস্ত্রই ভগবানের দিব্য নামজপের নির্দেশ প্রদান করে। চিন্ময় ধ্বনি জড় আবরণ ভেদ করে চিন্ময় সত্তাকে পরম সত্যের সম্মুখীন করায়। সেটিই চেতনার সর্বোচ্চ স্তর, পূর্ণ বিকশিত চেতন। এটি মানুষের শুধু বর্তমানের নয়; সর্বকালের চূড়ান্ত অভিযোজন।

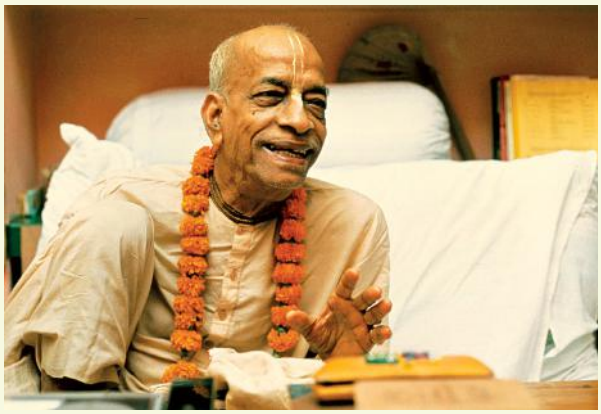

শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী শিষ্য এবং বর্তমানে ইসকন গভর্নিং বডির কমিশনার। তিনি বিগত তিন দশক ধরে সমগ্র বিশ্বভ্রমণ করে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার করছেন এবং অগণিত মানুষকে মার্গদর্শন প্রদান করেছেন।

প্রশ্ন ১। বহু পুণ্যফলে মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। তবে কলিযুগে মনুষ্যজন্ম সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হচ্ছে, তা হলে কলিযুগে কি পুণ্যবান বেশী?

—সুজিত মণ্ডল, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ আপনার ধারণা ঠিক নেই। জলজ প্রাণী, গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পক্ষী, পশু এভাবে কমপক্ষে আশি লক্ষ রকমের প্রজাতি রয়েছে। তাদের পাপপুণ্যের বিচার হয় না। কোনও কোনও জীবাত্মা এই সমস্ত ক্রম উন্নত দেহ ধারণ ও ত্যাগ করার পর মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য জীবনের কাজকর্মের পাপপুণ্য বিচার আছে। পাপকর্মফলে নরকে গতি, পুণ্যকর্মফলে স্বর্গে গতি হয়। তারপর পাপ ক্ষয় হলে কিংবা পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। তখন মানুষ কিংবা অন্য জন্ম নিতে হয়।

মহাভারতে শিব-পার্বতীর সংলাপে দেখা যায়, স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে যারা এসেছে তারা শ্রদ্ধাবান, প্রীতিভাবাপন্ন, সহানুভূতিশীল, সেবাপরায়ণ, ভক্তি পরায়ণ, সাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন হয়। নরক থেকে পৃথিবীতে যারা এসেছে তারা অশ্রদ্ধাবান, হিংসাভাবাপন্ন, মাৎসর্যপরায়ণ, স্বার্থপর, ভক্তবিরোধী, রাজসিক ও তামসিক গুণ সম্পন্ন হয়।

অধিকাংশ মানুষই যুগের ইতিহাস জানে না। সেইজন্য তারা বলে বসে যে, কলিযুগে না কি মনুষ্য জন্ম সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। কিন্তু কথাটি মোটেই সত্য নয়। বরং বিপরীত কথাটিই সত্য। সত্যযুগে, কিংবা ত্রেতা বা দ্বাপর যুগে মনুষ্য সংখ্যা যে পরিমাণ ছিল, এই কলিযুগে মনুষ্য সংখ্যা বহু বহু গুণে কমে গেছে।

কলিযুগে কীটপতঙ্গের সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে, জলজপ্রাণী প্রভৃতি ইতর জন্ম সংখ্যাই অধিক। সত্য, ত্রেতা বা দ্বাপরে এত অধিক সংখ্যক কীটপতঙ্গ ছিল না।

অন্যান্য যুগে মানুষের সংখ্যা বেশী হলেও একসঙ্গে বসবাস করতে কোনও অসুবিধা ছিল না। কারণ তারা ছিল প্রীতিভাবাপন্ন, শিষ্টাচারসম্পন্ন এবং সহানুভূতিশীল। কিন্তু কলিযুগে মানুষের সংখ্যা অল্প হলেও একসঙ্গে বসবাস করতে খুব অসুবিধা। কারণ কলিযুগের মানুষ হিংস্র, বঞ্চনাকারী, লোভী, লম্পট, খিটখিটে ও খল চরিত্রের।

এই কলিযুগে মানুষ-জন্ম পেয়ে যারা পরমার্থ সাধনে, কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে ব্রতী হচ্ছেন তাঁরা অবশ্যই সুকৃতিবন্ত ব্যক্তিত্ব। কারণ পরমার্থ সাধনা বিনা মনুষ্যজন্মের বাস্তবিক মূল্যমর্যাদা বলে কিছুই নেই।

বর্তমান সপ্তম মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চুতুর্যুগের অন্তর্ভূক্ত কলিযুগটির দুটি ভাগ আছে। প্রথম দিকের দশ হাজার বছরটি ধন্য কলিযুগ। তারপর চার লক্ষ সতেরো হাজার বছর ঘোর কলিযুগ। যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তনে যারা সামিল হচ্ছে, কৃষ্ণভক্তিময় জীবন যাপনে যারা উদ্যোগী হচ্ছে, তারা এই ধন্য কলিতে সচ্চিদানন্দময় ধামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর যারা সাধনভজনে মতি রাখে না, পাপ-পুণ্যের তোয়াক্কা করে না, আপন সংকীর্ণ স্বার্থপরতায় ডুবে আছে, তারা ঘোর কলিযুগের বিভীষিকা বুঝতে এখানে জন্ম নেবে।

প্রশ্ন ২। মুখে রাধে রাধে বলে, বৃন্দাবনে বাস করে, শান্তভাবে থাকে। মাধুকরী করে খায়, ভাগবত-তত্ত্বও বলে, কিন্তু যার-তার সাথে যৌন সঙ্গ করতে ছাড়ে না। এরকম ভক্ত মানুষের গতি কি?

উত্তর ঃ বৃন্দাবনে প্রচুর বাঁদর আছে। শেয়াল আছে। শূয়োর আছে। কুকুর আছে। বেড়াল আছে। তাদের মুখের ভাষা হয়তো বোঝা যাবে না। কিন্তু বৃন্দাবনে বাস করে। তারাও চুপ বা শান্তভাবে বসে থাকে। ঘরে বাইরে পথে ঘাটে খাবার সংগ্রহ করে। কিন্তু যে কোনও জুটি পেলেই যৌনসঙ্গ করে। অতএব সেই সব ইতর জীবনেই ফিরবার সুযোগ লাভ হবে সন্দেহ নেই। যস্য ভাবনা যাদৃশী।

প্রশ্নোত্তরে ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

ভগবদ্গীতার সাতটি অনবদ্য বৈশিষ্ট্য

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

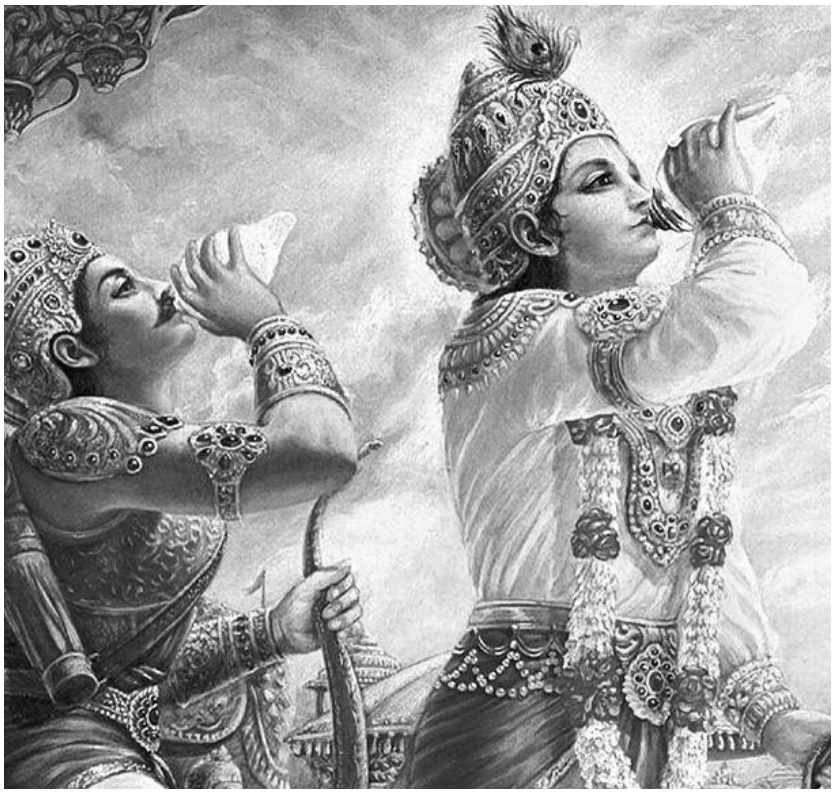

সর্বজনস্বীকৃত শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রসমূহের মধ্যে অন্যতম ভগবদ্গীতার অভ্যন্তরস্থিত জ্ঞানরূপ মুক্তাসকল যুগযুগান্ত ধরে মানব প্রজন্মের জন্য পথপ্রদর্শক আলোকস্তম্ভরূপে সেবা প্রদান করছে।

গীতা মাহাত্ম্য ৭ বলছে, একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতম্ঃ জগতে একটিই শাস্ত্র হোক, সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য সেই একক শাস্ত্র হোক — ভগবদ্গীতা। একে দেবো দেবকীপুত্র এবঃ সমগ্র বিশ্বচরাচরের একক ভগবান হোন — ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

ভগবদ্গীতার প্রারম্ভেই রয়েছে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং সমগ্র জীবাত্মার প্রতিনিধি অর্জুনের মধ্যে কথোপকথন যেখানে অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যস্থলে তার আবেগের সঙ্গে সংগ্রামে রত।

অর্জুনের দেহাত্মবোধ

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, অর্জুনের মতো ব্যক্তিত্ব যিনি তার সময়ের মহানতম যোদ্ধা তিনিও কুরুক্ষেত্রে তার জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে অসহায় বোধ করছেন।

অর্জুন যুদ্ধ না করার জন্য তার নিজস্ব যুক্তিগুলি প্রদর্শন করেছেন, 'আমি ক্ষত্রিয় একথা সত্য এবং আমার যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়া উচিত নয় কিন্তু এরা আমার আত্মীয়, শত্রু নয়। যদি আমি এদের হত্যা করি আমি পাপের ভাগী হব।'

একথা সত্য যে, অধিকাংশ সময়েই পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না কিন্তু আমাদের চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে আমরা আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারি। যদি আমরা জয়লাভ করতে সক্ষম হই সেক্ষেত্রে অর্জুনের মতো একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হতেই পারে কিন্তু সেখানে জীবন যুদ্ধে সংগ্রামের উৎসাহ আমরা হারিয়ে ফেলতে পারি।

অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধারূপে এসেছেন কিন্তু ভীষ্ম এবং দ্রোণকে দেখে তিনি নিজেকে পৌত্র, শিষ্য এবং ভ্রাতারূপে ভাবতে শুরু করলেন।

যোদ্ধারূপে তাঁর কর্তব্য ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করা কিন্তু একজন পৌত্ররূপে তাঁর কর্তব্য ভীষ্মকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

যোদ্ধারূপে কৌরবপক্ষের ভয়ানক যোদ্ধা দ্রোণাচার্যকে হত্যা করা তাঁর কর্তব্য। কিন্তু শিষ্যরূপে তিনি শিষ্যের কর্তব্য স্মরণ করছেন।

ভ্রাতারূপে তাঁর ভ্রাতৃবর্গের প্রতি স্নেহ এবং ভালোবাসা প্রদর্শন করা উচিত এবং তাদের ধ্বংস করা অনুচিত।

এই দেহাত্মবোধ অর্জুনকে এত অসহায় করে তুলেছিল যে, তিনি কাঁপতে শুরু করেছেন এবং তাঁর গাণ্ডীব তাঁর হাত থেকে পড়ে যাচ্ছে।

তাঁর জীবনের এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে একটি ক্ষুদ্র ভ্রমও তার খ্যাতি এবং মহাযুদ্ধে পাণ্ডবদের ভাগ্যকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

যথার্থ চেতনায় যুদ্ধ

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন যে, অর্জুন যখন যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তিরস্কারের ভঙ্গিতে অর্জুনকে বলেন, 'বর্তমানে তুমি আমার বাক্য অনুধাবন করতে সক্ষম নও কিন্তু পরবর্তীকালে একজন মহান যোদ্ধারূপে তোমার যুদ্ধ করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রবল হবে। তুমি ভীষ্মসহ অন্য যোদ্ধাদের হত্যা করতে নিজেই উদ্যত হবে, আমি তখন তোমাকে দেখে হাসব।'

যদিও যুদ্ধ না করার পক্ষে অর্জুন অনেক যুক্তি দিচ্ছিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞাত ছিলেন যে, ক্ষত্রিয় বংশ জাত রূপে তিনি অবশ্যই যুদ্ধ করবেন।

যদি অর্জুন নিজেই যুদ্ধ করতেন সেক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ কেন অর্জুনকে ভগবদ্গীতার বাণী প্রদান করেন?

কারণ শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছিলেন অর্জুন যথার্থ চেতনায় অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনায় থেকে যুদ্ধ করুন। যদি অর্জুন প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে খেয়ালের বশে যুদ্ধ করেন সেক্ষেত্রে তিনি ভুল করতে পারেন যার জন্য কর্মফল ভোগ করতে হতে পারে। যদি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে যুদ্ধ করেন তাহলে শুধু বিজয়ীই হবেন না, তাকে কোন কর্মফলও ভোগ করতে হবে না।

অর্জুন অবগত হলেন যে, বিপদে এমন একজনের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করা শ্রেয় যিনি বিশ্বাসযোগ্য, শুভার্থী এবং অপেক্ষাকৃত অধিক জ্ঞানী। সেহেতু দ্বিধাহীনভাবে তিনি কৃষ্ণের নিকট আবেদন করেন, 'বর্তমানে আমি আমার কর্তব্য সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত এবং দুর্বলতার কারণে সকল স্থৈর্য হারিয়েছি। এই পরিস্থিতিতে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি আমার পক্ষে যা নিশ্চিতরূপে সর্বোত্তম আমাকে তা বলুন। এখন আমি আপনার শিষ্য এবং আপনার শরণাগত এক আত্মা। কৃপা করে আমাকে নির্দেশ প্রদান করুন।'

যদি আমরাও শ্রীকৃষ্ণের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করি সেক্ষেত্রে বিপদের সম্মুখীন হলে আমরাও নিশ্চিত হব কোথায় এবং কার শরণাগত হতে হবে।

নিত্য সত্তা সম্বন্ধে সচেতনতা

শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করেন যে, যখন আমরা ভিন্ন ভিন্ন সত্তার সম্মুখীন হই তখন আমাদের সকল সত্তার ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের আধ্যাত্মিক সত্তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে, যে সত্তা নিত্য এবং অপরিবর্তনীয়। এই অনিত্য জগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল সত্তাই শুরু হয় এবং শেষ হয়। এই জগতে কোন সত্তা যদি আমাদের আধ্যাত্মিক কর্তব্য সম্পাদনে বাধা প্রদান করে সেক্ষেত্রে আমাদের নিঃশর্তভাবে সেই সত্তাকে ত্যাগ করতে হবে।

যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণের অংশরূপে আমাদের আধ্যাত্মিক সত্তায় অবস্থান করি তাহলে কোন জাগতিক পরিস্থিতিতেই আমরা হতবুদ্ধি হব না। কৃষ্ণ সর্বজ্ঞ নেতারূপে জড়জাগতিক দুঃখময় ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের পথপ্রদর্শন করে সহায়তা করবেন।

কৃষ্ণভাবনামৃতে অবস্থানকারী কর্ম

এই জগতের প্রকৃতি হলো যন্ত্রণা আসবে, হতবুদ্ধিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। কিন্তু যদি আমরা ভগবদ্গীতার বাণী দ্বারা আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে পরিশুদ্ধ করি সেক্ষেত্রে সকল সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতি সহ্য করার শক্তি পেয়ে সুচারুরূপে আমরা সেই সকল বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির মোকাবিলা করার সমাধান পাব।

যতদিন আমরা এই জগতে জীবিত থাকব আমাদের কর্ম করতে হবে। আমরা কেউ কর্মহীন অলস জীবনযাপন করতে পারব না। যদি আমরা নিজেদের নিয়মে কর্তব্য পালন করি

তখন আমরা জড়জাগতিক নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ থাকব। যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্রে স্থাপন করে কর্ম করি তখন আমরা কৃষ্ণের জন্য কর্ম করব এবং কৃষ্ণ সর্বদা আমাদের নির্দেশ প্রদান করে রক্ষা করবেন।

অর্জুনের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন

মানব জীবনে কঠিন পরিশ্রম করতে হয় এবং অর্জুনের ন্যায় ধর্মানুসারী যেকোন কর্মে আমাদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা প্রদান করতে হবে।

আমাদের সকল জাগতিক পরিচয় সত্ত্বেও নিজেদের খেয়াল খুশীমতো না চলে সর্বদাই আমাদের শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ গ্রহণ করা উচিত।

ভগবদ্গীতা হচ্ছে এক অপ্রাকৃত সাহিত্য, যা অতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। ভগবদ্গীতার নির্দেশকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারলে, অতি সহজেই সমস্ত ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

ভগবদ্গীতার মৌলিক বিশেষত্বসমূহ

১. ভগবদ্গীতা নিশ্চিতরূপে প্রদর্শন করে যে, শ্রীকৃষ্ণ কোন সাধারণ জীবাত্মা নন। তিনি পরমেশ্বর ভগবান (গীতা ৯। ১০, ১০। ১২, ১০। ১৩, ১০। ৮, ১৪। ৪)। সেহেতু ভগবদ্গীতার শিক্ষা যথার্থ এবং সর্বকালোপযোগী কারণ এটি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত।

২. গীতায় একথা সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, আমরা, জীবাত্মারা যন্ত্রণা পাই যেহেতু আমরা কৃষ্ণবিমুখ। সেহেতু অর্জুনের ন্যায় আমাদেরও জীবনের রাশ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীহস্তে অর্পন করতে হবে।

৩. গীতায় ভক্তদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাঁর শরণাগত হলে তারা যন্ত্রণাহীনভাবে সকল পাপ থেকে মুক্ত হবে। (গীতা ১৮। ৬৬)

৪. প্রেমময় পিতা যেমন তার সন্তানের দায়ভার বহন করে, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপে তাঁর ভক্তদের সকল দায়িত্ব বহন করে তাদের জীবনে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু প্রদান করেন। (গীতা ৯। ১২)

৫. গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি এবং সেবাকে মহিমান্বিত করেছেন (গীতা ৬। ৪৭) এবং ব্যাখ্যা করেছেন এগুলির অভ্যাস বাস্তবিকভাবেই অত্যন্ত সহজ সরল। (গীতা ৯। ২৬, ৯। ২৭)

৬. শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শরণাগত আত্মাসকল পরিশেষে তাঁর কৃপায় তাঁর নিত্য চিন্ময় ধামে গমন করবে। (গীতা ১৫। ৬, ১৮। ৫৬)

৭. ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন যুক্তি এবং উদাহরণের মাধ্যমে নিরন্তর উপস্থাপন করেছেন যে, যত শীঘ্র তাঁকে বিস্মৃত হওয়া জীবাত্মাগণ তাঁর নিকটে এসে তাঁর নির্দেশানুসারে কর্ম আরম্ভ করবে তাদের জীবন সার্থক হবে। সেইজন্য ভগবদ্গীতার শেষ শ্লোকে বলা হয়েছে, 'যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্ধর পার্থ, সেখানেই নিশ্চিতভাবে শ্রী, বিজয়, অসাধারণ শক্তি ও নীতি বর্তমান থাকে।'

গীতা মাহাত্ম্য ১-এ বলা হয়েছে যে, ভগবদ্গীতা হচ্ছে এক অপ্রাকৃত সাহিত্য, যা অতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। ভগবদ্গীতার নির্দেশকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারলে, অতি সহজেই সমস্ত ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

পুরুষোত্তম নিতাই দাস ইসকন কোলকাতার ভক্তিবৃক্ষের একজন সদস্য। তিনি আই. বি. এম.-এ পরামর্শদাতা রূপে কর্মরত। তিনি ব্লগ লেখেন http:/krishnamagic.blogshot.co.uk/

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত'র কার্যাবলী

ইসকনের আন্তর্জাতিক অবদানকে স্বীকৃতি দিল বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন

ইসকন নিউজ ঃ বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন — একটি বৃহত্তম আন্তর্জাতিক হিন্দু সম্মেলন যেখানে ৬০টি বিভিন্ন দেশ থেকে ২৫০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি তাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁর কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘকে বিশ্বে ভগবদ্গীতার শিক্ষা প্রসারের এবং মানবজাতির কাছে হিন্দু ধর্মের শিক্ষার জন্য স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

ইসকন জিবিসি এবং আন্তর্জাতিক নির্দেশক অনুত্তম দাস হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের তরফে অভিনন্দন স্মারক গ্রহণ করেন।

পূর্ণ অধিবেশনটির সূচনা হয় সংস্কৃত প্রার্থনা দিয়ে যেটি পাঠ করেন চন্দ্রিকা ট্যান্ডন যিনি একজন নামী স্বীকৃত শিল্পী এবং নিউইর্য়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি। দলাই লামার একটি চিত্রবার্তাও প্রদর্শন করানো হয় যেটিতে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীরও বার্তা ছিল।

তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে আধ্যাত্মিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদ্গণ, বাণিজ্য নেতৃবৃন্দ এবং বিখ্যাত ব্যক্তিত্বগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন যাদের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের জন্য এক বিশ্বমঞ্চ তৈরী করা যেখানে ভাব, অন্যকে উৎসাহ প্রদান এবং সর্বসাধারণের হিতকর ব্যবস্থাগুলিকে বিকাশ করা।

ইসকন তরুণ প্রজন্ম এবং পেশাধারী ভক্তদের পেশা সম্মেলন

মাধব দাস ঃ ৮ই সেপ্টেম্বর নিউজার্সি ইসকন টোবাকো মন্দিরে প্রায় ত্রিশ জন হাই স্কুল এবং নব্যকলেজ তরুণেরা তাদের পিতামাতার সঙ্গে কলেজ এবং পেশা সম্মেলনে যোগদান করেন।

প্রায় চল্লিশ জনের মতো ভক্ত স্বেচ্ছাসেবক যারা প্রত্যেকেই পেশাদার কর্মী বা সদ্য কলেজ স্নাতক; ছাত্রদের সঙ্গে কর্মশালা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং কর্ম সম্পর্ক স্থাপনের ওপর গুরুত্ব দেন। সংগঠক গোপিকা এবং আকাশ শর্মা পেবাকো হতে, যশ গুপ্তা, ইসকন সেন্ট্রাল নিউ জার্সি থেকে —এই সম্মেলনের আয়োজন করেন।

অনুষ্ঠানটি দুটি প্রদর্শনী দিয়ে শুরু হয় — একটি পিতামাতার জন্য এবং অপরটি ছাত্রদের জন্য যাতে দুপক্ষই পৃথক পৃথক ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

প্রথম কর্মশালাটি ছিল রাধারমণ দাসের, যিনি উটা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব বিভাগের প্রধান। তার কর্মশালাটির নাম 'ফাইন্ড ইয়োর পাথ'।

অন্য এক পেশাদার তালিকাভুক্তরা তাদের পেশাগত জীবনক্রম, ভুল, উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেন।

রাধাকৃষ্ণ রেকর্ডের দশম বর্ষ পূর্তি উৎসব

ইসকন নিউজ ঃ রাধাকৃষ্ণ রেকর্ড — যার স্বত্বাধিকার মন্দির কর্তৃপক্ষের তার দশম বর্ষ পূর্তি আগামী জুলাই ২০১৯ সালে লন্ডনের রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের শ্রীশ্রী রাধা লন্ডনেশ্বরের ৫০ বর্ষ পুর্তি উৎসব উপলক্ষে উদ্‌যাপিত হবে।

উদ্‌যাপনের এমন পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে থাকবে বৃহৎ প্রদর্শনী, ইন্‌ডোর ফেস্টিভ্যাল, যাতে করে লন্ডনের জনগণের হরেকৃষ্ণ আন্দোলনকে তাদের জীবনের প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় যেমন সঙ্গীত, খাদ্য, দীর্ঘস্থায়ী সুখ এবং প্রেমভক্তির গভীর দর্শন সম্বন্ধে শ্রবণ ইত্যাদি।

এই অনুষ্ঠানে রাধাকৃষ্ণ রেকর্ড একটি অ্যালবাম প্রকাশ করবে যার নাম মন্ত্রলাউঞ্জভল্যুম-ও যা কনভেন্ট গার্ডেনের সাপ্তাহিক মন্ত্রলাউঞ্জ প্রোগ্রাম থেকে প্রকাশিত হবে। এর মধ্যে প্রার্থনা মূলক ভজন — হরি হরি বিফলে, ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের মূল সুর অভিজাত সঙ্গীত যন্ত্র যেমন পিয়ানো, অ্যার্কেস্টিক গীটার, ক্ল্যারিওনেট এবং এস্রাজ সমন্বিত হবে। কণ্ঠ সঙ্গীত স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে থেকে হবে যেমন জাহ্নবী হ্যারিসন, আনন্দমোনেট এবং রাধা লন্ডনেশ্বর দাস ইত্যাদি।

গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভক্তি এবং বিজ্ঞান

পৃষ্ঠিদেবী দাসী ঃ ফ্লোরিডার গেইন ভিলের কলম্বিয়া জাত ভক্ত বৈজ্ঞানিক মুরলীগোপাল (মেরিশিয় গ্যারিডো Ph.D) সকল ইসকন ভক্তদের কাছে এই বার্তা প্রচারে দৃঢ়চিত্ত ছিলেন, কিভাবে তিনি আমাদের বৈজ্ঞানিকদের এবং অন্যান্য শিক্ষাবিদদের এই জানুয়ারীতে গেইনভিলের ভক্তিবেদান্ত ইনস্টিটিউট ফর হায়ার স্টাডিসে (BIHS) 'কনসাস ইন সায়েন্স' সম্মেলনে যোগদানে উৎসাহিত করতে পারেন।

মুরলী লন্ডনে মিষ্ট্রিস্ অব দা সেক্রেট ইউনিভার্স (MSU) এর তিনটি উপস্থাপনা করেন — দুটি ভক্তিবেদান্ত ম্যানোরে এবং তৃতীয়টি সোহস্ট্রীট মন্দিরে যেখানে ভক্তি রসামৃত স্বামীর আহ্বানে বিশাল সমাবেশ হয়েছিল। শ্রোতাগণ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছিলেন, মুরলী ব্যাখ্যা করেন, 'সম্মেলন শেষে অনেক ভক্ত আমাকে বলেন যে, এবার তারা ভাগবত পাঠ করতে উৎসাহিত বোধ করছেন।'

পরবর্তী গন্তব্য ওয়েলস-এ। কার্ডিকের আত্মাকাফেতে এক ঘন্টার সম্মেলন হয়। এখানে মুরলী উপলব্ধি করেন যে অধিকাংশ ভক্তই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেননি, সেই জন্য 'ক্রিয়েটিং আ স্পিরিচুয়েল সঙ্গ' তার মূল প্রচারের একটি অংশ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি ভক্তদের ভাগবত উৎসাহ কর্মে উৎসাহিত করে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একত্রে ভাগবত পাঠকারী স্থানীয় দলে গঠন করেন। অবশেষে শৌনক ঋষির সঙ্গে অক্সফোর্ডে একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণে তার বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণ পূর্ণতা পায়।

সাত সপ্তাহ ইউরোপ ভ্রমণ শেষে আমেরিকা ফিরে এসে মুরলী তার BIHS সহকর্মীদের মুগ্ধ করেন, 'প্রত্যেকে এটা জেনে আনন্দিত ছিল যে, এমন অনেক ভক্ত আছে, যারা বিজ্ঞানসম্মত ভক্তিযোগের আবিষ্কারের সম্ভাবনায় গভীর উৎসাহী, অনেক ভক্তই আমাদের সঙ্গে কাজ করতে উৎসুক।' কৃষ্ণভাবনামৃত লেখক চিন্তামনিধাম উৎসাহের সঙ্গে বলেন, 'এটি খুব আনন্দের যে, আমরা এখন বৈদিক বিজ্ঞানকে জানার একটি সূত্র পেয়েছি!'

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার প্রাথমিক আলোচনা

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

(২য় অধ্যায়)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দ্বিতীয় অধ্যায়কে সমগ্র গীতার সার বলে বর্ণনা করেছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার বিষয়বস্তু হলো কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং সমগ্র গীতার সারমর্মরূপ ভক্তিযোগেরও আভাস দেওয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে ১নং শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করছেন সঞ্জয়কে, 'আমার পুত্র ও পাণ্ডুর পুত্রেরা তারপর কি করল?' কারণ ধৃতরাষ্ট্র ভালভাবে জানতেন ধর্মক্ষেত্রের প্রভাব সম্বন্ধে। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সঞ্জয় বললেন এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে — অর্জুন যুদ্ধ না করার পিছনে চারটি কারণ দেখিয়ে ধনুর্বাণ ত্যাগ করে উদাসীনের ন্যায় রথের উপরে বসে পড়েছেন।

সঞ্জয়ের উক্তি দিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ — অর্জুন এমন স্থিতিতে অবস্থান করছিলেন কিছুক্ষণের জন্য, একেবারে চুপচাপ ছিলেন। ঐ সময় ভগবান মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণও চুপচাপ ছিলেন, কেন না ঐ সময় অর্জুন কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ভগবানও অর্জুনের হৃদয়ে বসে সব কিছু দেখছিলেন, কিভাবে অর্জুন মোহগ্রস্ত হয়ে শোকের দ্বারা মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। অর্জুন এও মনে মনে চিন্তা করছিলেন শ্রীকৃষ্ণ যেমন মধু নামক দৈত্যকে হত্যা করেছিলেন ঠিক তেমনি তিনি যেন অজ্ঞতারূপ দৈত্যকে বধ করে তাঁর কর্তব্যকর্মে তাঁকে নিযুক্ত করেন। ভগবান অন্তর্যামী তাই ভক্তের মনোভাব অনুযায়ী ২নং শ্লোকে ভগবান প্রথম সরাসরি অর্জুনকে ভর্ৎসনার মাধ্যমে 'অনার্য' বলে সম্বোধন করলেন। অনার্য মানে — যিনি জীবনের প্রকৃত মূল্য জানেন না বা যিনি শাস্ত্রনীতি মেনে চলেন না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ ভালভাবে জানেন অর্জুন তাঁর পিসির ছেলে। তাঁর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে। (৩নং শ্লোকে) হৃদয়ের দুর্বলতার কারণে পিতামহ ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইছে না। ৪নং ও ৫নং শ্লোকে অর্জুন একজন সাধারণ মানুষের মতো প্রশ্ন করছেন পিতামহ ও দ্রোণাচার্য তাঁরা আমার গুরুজন ও পূজনীয় তাঁদের কিভাবে হত্যা করব। হে কৃষ্ণ, আপনি কি পারবেন, আপনার পিতামহ উগ্রসেন ও গুরুদেব সান্ধীপনি মুনিকে আক্রমণ করতে। তাই ৬নং শ্লোকে যুদ্ধ না করার পঞ্চম যুক্তি দেখাচ্ছেন 'সিদ্ধান্তহীনতা'।

যদি তিনি যুদ্ধ করেন — যুদ্ধে জয় লাভ করলে, জয়ের আনন্দ তিনি কাদের নিয়ে উপভোগ করবেন। কারণ সকলে মারা গেলে কাদেরকে দেখাবে। আর —

যদি যুদ্ধ না করেন — ভিক্ষাবৃত্তিই হবে জীবন ধারণের একমাত্র উপায়। ক্ষত্রিয়ের কাছে তা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এতেও তিনি উপভোগ করতে পারবেন না।

জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়ার জন্য এবং জীবনের প্রকৃত সমস্যা সমাধানের জন্য একজন সদ্‌গুরুর প্রয়োজন— যিনি গুরুপরম্পরা ধারায় যুক্ত। অর্জুনও দেখলেন এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমাকে সদ্‌গুরুর চরণে শরণাপন্ন হতে হবে — তাই ৭নং শ্লোকে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাপন্ন হলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, দাবানল আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে ঠিক তেমনি সংসারে আপনা থেকেই ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত শ্রীকৃষ্ণের চরণের শরণাগত হওয়া। ৮নং শ্লোকে অর্জুন পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন জাগতিক ধনৈশ্বর্য কখনও প্রকৃত সমস্যার সমাধান করতে পারে না। কারণ আমাদের প্রকৃত সমস্যা জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি। একটা হাসির কাহিনী বলি, একবার পুরুলিয়ার একটা স্কুলে প্রচারে গিয়েছিলাম। ঐ সময় একজন মাষ্টারমহাশয় বললেন, 'আমি চাকরী করি, আমার স্ত্রী চাকরী করে। আমার বাবা চাকরী করে, আমার মা চাকরী করে। কি দরকার ভক্তি করার?' আমি বললাম হাসতে হাসতে, আপনার কথা মতো যাদের অনেক টাকা আছে তাদের ভগবদ্ভক্তি করার কোন প্রয়োজন নেই — গীতা, ভাগবত ও হরিনাম করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু গীতায় আমাদের সেই শিক্ষা দিচ্ছে না — গীতা ২। ৮ নং শ্লোকে। আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দেব যদি মন দিয়ে শোনেন। তখন সকল মাষ্টার মহাশয়গণ মনযোগ দিয়ে শুনছেন। মনে করুন, আপনারা চারজনেরই পূজার ছুটিতে গৌহাটীতে 'মা কামাক্ষ্যা' মন্দির দর্শন করতে যাবেন। তা শুনে আপনার স্কুলে আর একজন মাষ্টার মহাশয় ও ক্লার্ক বললেন আমরাও যাবো। খুব আনন্দে সকলেই টিকিট কাটলেন — আপনারা যেহেতু চারজনেই মাষ্টারী করেন তাই ১নং এ.সি. কামরায় সীট বুকিং করলেন। মাষ্টার মহাশয় ২য় শ্রেণী ও ক্লার্ক জেনারেল টিকিট কাটলেন। সকলেই যাচ্ছেন হাওড়া থেকে মেলে করে — আপনি যতক্ষণ ট্রেনে

আছেন কি সুবিধা পাচ্ছেন — ১টি কম্বল, বেড সিট, বালিশ, খাবার, জলের বোতল আর ঠাণ্ডা। কোন হকারের ঝামেলা নেই। কিন্তু ২য় শ্রেণী উপরি উল্লিখিত কোন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না। উপরন্তু হকারের চিৎকার আর যিনি জেনারেল সব সময় হকারের চিৎকার রাত্রে শোয়ার কোন সুবিধা নাই। কিন্তু ২য় শ্রেণীর মাষ্টার মহাশয় রাত্রে শোয়ার সুবিধা পাচ্ছে— কিন্তু যখন গৌহাটী ষ্টেশনে নামলে তখন যদি আপনি বলবেন আমি এ.সি. কামরার লোক আমাকে পাশ দিন তখন কিন্তু সকলেই একই গোঁতাগুঁতি ঠেলাঠেলি খেতে হবে। ঠিক সেই রকম আমাদের সকলকেই জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির দুঃখ পেতেই হবে। শাস্ত্রে তাই বলছে — অর্থনৈতিক উন্নতির মাধ্যমে কখনই এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না।

৯নং শ্লোকে আমরা দেখতে পাই অর্জুন যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নিলেন তা শ্রবণ করে ধৃতরাষ্ট্র খুব আনন্দ পেলেন কিন্তু সঞ্জয় মুখের দিকে তাকিয়ে এও জানালেন অর্জুনের একটি নাম 'পরন্তপ'।

১০নং শ্লোকে ভগবান স্মিত হাসলেন — এর কারণ তিনি একটি বিশেষ কার্য সাধন করবেন। যেমন শিবজী যখন বললেন, 'হে প্রভু আমি আপনার সেই রূপ মোহিনী মূর্তি দর্শন করতে চাই আমার কিছুই বিকার হবে না। কারণ আমার সঙ্গে পার্বতী আছে।' ভগবান না করা সত্ত্বেও শিবজী যখন কারণ দেখালেন, তখন ভগবান স্মিত হেসে নিজেই কিশোরী কন্যার রূপ ধারণ করে একটা বিশেষ শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। (ভাগবতম্ ৮ম স্কন্ধ)

১১নং শ্লোকে ভগবান এই প্রথম গুরুর ভূমিকা গ্রহণ করে শাসন মূলক কথা বললেন। গুরুর কাজ সবসময় শিষ্যকে শাসন করে শিক্ষা প্রদান করা আর শিষ্যের কাজ গুরুর শাসনকে মাথা নত করে গ্রহণ করা। শ্রীকৃষ্ণ কড়া ভাষায় বললেন, পন্ডিতের মত কথা বলছো, আসলে তুমি একটা বড় মূর্খ। কারণ, পন্ডিত দেহ-আত্মার পার্থক্য সম্বন্ধে জানেন, জীবিত ও মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে জানেন। কিন্তু তুমি না জেনে বড় বড় কথা বলছ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রথম যুক্তি যুদ্ধ না করার কারণ ছিল করুণা বা দয়া তা খন্ডন করলেন ১১নং শ্লোক থেকে ৩০ নং শ্লোক পর্যন্ত।

১২নং শ্লোক মায়াবাদ খন্ডন করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুনের যুক্তি দেখাতে পারেন দেহের পরিবর্তন তো শোকের কারণ তাই ভগবান ১৩নং শ্লোক বললেন — দেহ সবসময় পরিবর্তন হচ্ছে। বিশেষ করে এই শ্লোকটি প্রমাণ করে গীতা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নয় কারণ সকলেরই দেহ পরিবর্তন হয়।

অর্জুন মনে করতে পারে বর্তমান শরীরটা আছে তা হারালে তো দুঃখ হবেই তাই ভগবান ১৪নং শ্লোকে বললেন— সব কিছু সহ্য করতে হবে কারণ প্রকৃতির নিয়মে গ্রীষ্ম ও শীতকাল আসে কিন্তু মায়েরা গ্রীষ্ম কালে রান্না বন্ধ করে দেয় না ঠিক সেই রকম প্রয়োজনে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হয়। এই জ্ঞানটি যিনি লাভ করেছেন ১৫নং শ্লোকে তিনিই মুক্তি লাভের অধিকারী। এই কথাটা আমি বলছি না ১৬ নং শ্লোক তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষরা উপলব্ধি করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ১৭নং শ্লোক থেকে ২৫নং শ্লোক পর্যন্ত জীবাত্মার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভগবান বললেন —

১) আত্মার পরিচয় — পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বা ভগবানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ হবার ফলে, ভগবানের গুণাবলীর অণুসদৃশ অংশ জীবদের মধ্যেও আছে। যার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে একটি।

২) আত্মার পরিমাপ বা সাইজ — শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উল্লেখ আছে একটি চুলের অগ্রভাগের দশহাজার ভাগের এক ভাগ ১/১০,০০০। এই সাইজ সকলের। এক ক্ষুদ্র পিপীলিকা থেকে শুরু করে এমনকি শিব ও ব্রহ্মা পর্যন্ত একই সাইজ। যেহেতু এটি চিন্ময় তাই কোটি কোটি জন্মের পাপ-পুণ্য ধরে রাখতে পারে। যেমন মেমোরি কার্ড সাইজ একই রকম ধরে রাখার ক্ষমতা অনুযায়ী ৮ জিবি, ১৬ জিবি, ৬৪ জিবি। কিন্তু এই মেমোরি কার্ড জড় কিন্তু আত্মা জড় নয় — চিন্ময় এটা মনে রাখা দরকার।

৩) আত্মা যেহেতু ভগবানের অংশ তাই কাটা যায় না, শুকানো যায় না, পোড়ানো যায় না, জলে ভেজানো যায় না।

৪) আত্মার অবস্থান — হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করে এবং পাঁচ প্রকার বায়ুতে ভাসমান অবস্থায় থাকে। (প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান) তবে আমরা যখন ঔষধ খাই তার ক্রিয়াশীলতা যেমন সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয় তেমনি চিন্ময় আত্মার প্রবাহও চেতনারূপে সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়ে। তাই কোথাও ব্যথা পেলে বুঝতে পারি। হৃদয়ে ফুসফুস থাকে তাই যে সমস্ত রক্তকণিকা ফুসফুস থেকে অক্সিজেন বহন করে তারা তাদের শক্তি আহরণ করে আত্মা থেকে। রক্তকণিকাগুলি যখন ক্লান্ত হয়ে যায় পুনরায় আবার আত্মা থেকে শক্তি নিয়ে শক্তি প্রাপ্ত হয় কিন্তু আত্মা যখন জড় দেহ ছেড়ে চলে যায় তখন আর শক্তি পায় না তাই রক্ত সঞ্চালন, শ্বাস-প্রশ্বাস আদি দেহের সমস্ত কার্যাবলী বন্ধ হয়ে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা রক্তকণিকার এই গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। ১৭নং শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ তা উল্লেখ করেছেন।

৫) আত্মার মহিমা কেউ উপলব্ধি করতে পারে? — যিনি সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত ও শোক থেকে মুক্ত এবং ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত তিনিই কেবল উপলব্ধি করতে পারেন।

৬) কীভাবে আত্মার দেহান্তর সম্ভব — একমাত্র পরমাত্মার কৃপায়। পূর্বকৃত কর্মফল ও বাসনা অনুসারে হৃদয়ে পরমাত্মা অবস্থান করে পরম বন্ধুর মতো সাহায্য করেন। বাসনা অনুযায়ী নতুন দেহ দান করেন। যেমন আপনি মাংস খেতে খুব ভালবাসেন তাই নরকে নিয়ে গিয়ে খুব ভাল করে আপনাকে অভ্যাস করিয়ে বাঘের দেহ প্রদান করবেন।

৭) আত্মাকে আগুনে পোড়ানো যায় না বলে সূর্যলোকেও প্রাণী আছে। বিজ্ঞানীরা এখন স্বীকার করে বলছেন অগ্নি ব্যাকটেরিয়া আছে।

৮) কেন আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে না — ২৯নং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন এর কারণ আত্মা এত সূক্ষ্ম যে মানুষ তার ক্ষুদ্র জ্ঞান ও সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করতে পারে না, তাই আশ্চর্য বলে দেখেন, আশ্চর্য বলে ব্যাখ্যা করেন, আশ্চর্য বলে শ্রবণ করেন। এবং জেনে শুনেও উপলব্ধি করতে পারে না। এটি সম্ভব ভগবদ্ভক্তের অহৈতুকী কৃপার ফলে।

৩০নং শ্লোকে ভগবান উপসংহার দিলেন ক্ষত্রিয় হিসেবে পিতামহ ও গুরুদেব যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করবে এই ভয়ে কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করা উচিত হবে না।

৩১নং শ্লোক থেকে ৩৮নং শ্লোকে ভগবান ব্যাখ্যা করেছেন কর্মকান্ড হিসেবে যুদ্ধ কর আর কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে জড় বিষয় উপভোগ কর। আর প্রথম অধ্যায়ে যুদ্ধ না করার দ্বিতীয় কারণ রাজ্যসুখ ভোগ ও তৃতীয় কারণ পাপের ভয়— সেই যুক্তি খন্ডন করছেন। ৩১নং ও ৩২নং — স্বধর্ম বা কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে জড়জাগতিক সুখ উপভোগ করা যায় এই পেক্ষাপটে যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের (অর্জুনের) স্বধর্ম বা কর্তব্যকর্ম।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'পাপের ভয়' খন্ডন করেছেন ৩৩নং - ৩৭নং শ্লোকের মাধ্যমে। কর্তব্যকর্ম পরিত্যাগই পাপ ও অপযশের কারন। এছাড়া শিবের কাছ হতে পাশুপাত অস্ত্র এনেছো। দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে অস্ত্র শিক্ষা লাভ করেছ এবং দেবসভা থেকে অস্ত্র এনেছ। আর একজন সম্মানীয় ব্যক্তির কাছে অপমান মৃত্যু তুল্য। শত্রুরা উপহাস করবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলে। ৩৮নং ভগবান সিদ্ধান্ত স্থাপন করলেন — জড় জাগতিক সুখ দুঃখের ভিত্তিতে অর্জুন তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে না — তোমার কর্তব্য সম্পাদনের জন্য যুদ্ধ কর। যুদ্ধ করলে পাপ হবে কি না সে বিষয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই — কর্তব্য কর্ম হিসেবে যুদ্ধ করলে পাপ হবে না। ৩৯-৫০নং শ্লোকের মাধ্যমে ভগবান বোঝাতে চাইলেন বুদ্ধিযোগের স্তরে যুদ্ধ করলে কোন ফলভোগ করতে হবে না। ৩৯নং শ্লোকে বুদ্ধিযোগের সংজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণ গুরুর ভূমিকা নিয়ে বলেছেন, কেবল ভগবানের ইন্দ্রিয় তর্পনের জন্য ভগবৎ সেবার অনুশীলন কর। ৪০নং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বললেন — এই যোগে কোন ক্ষয় নাই। অনুষ্ঠাতাকে মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করে। আর কোন বৈশিষ্ট আছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে ৪১ নং শ্লোক যারা এই পথ অবলম্বন করেছেন তাদের বুদ্ধি একনিষ্ঠ কিন্তু সকাম ব্যক্তিদের বুদ্ধি বহুশাখা বিশিষ্ট।

৪২-৪৩নং শাস্ত্রের প্রতি অজ্ঞ মানুষদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যই কর্মকান্ড এবং এর ফল স্বরূপ স্বর্গসুখ বিষয়ে অতি প্রশংসা করা তাকেই বেদের পুষ্পিত বাক্য বলে। বিচারহীন মূঢ় ব্যক্তিরা অনিত্য স্বর্গসুখের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরমার্থকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। যেমন অজ্ঞ ব্যক্তিরা বাহ্য সৌন্দর্য দেখে আকৃষ্ট হয়ে সৌরভহীন পুষ্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ঐ পুষ্পকেই শ্রেষ্ট বলে মনে করে। ৪৪নং - ৪৬নং শ্লোকে ভগবান বললেন ভোগ ও ঐশ্বর্যসুখে আসক্ত না হয়ে ত্রিগুণের ঊর্ধ্বে ওঠ তাহলে বেদের উদ্দেশ্য কি জানতে পারবে। অর্জুনের চতুর্থ যুক্তি 'কুলনাশ' ভগবান এখানে খন্ডন করেছেন।

৪৭নং স্বধর্ম আচরণের কথা বললেন এবং ৪৮নং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ মেনে চলা এবং জয়-পরাজয়ের আশা শ্রীকৃষ্ণের উপর ছেড়ে দেওয়াই প্রকৃত যোগ তা অর্জুনকে বুঝিয়ে দিলেন। ৪৯নং সকাম কর্মসমূহ পরিত্যাগ করে বুদ্ধি যোগে যুক্ত হও বা ভক্তি যোগে যুক্ত হওয়ার কথা বললেন। তারপর ৫০-৫৩নং ভক্তিযোগের পাঁচ প্রকার উপকারের কথা বললেন — ১) পাপকর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি (৫০নং), ২) জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি (৫১নং), ৩) স্বরূপ উপলব্ধি ও ভগবদ্ধামে গমন (৫৩নং)। ৫৪-৭২ নং বুদ্ধিযোগের স্তরে উন্নীত আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ।

৫৪নং শ্লোকে চারটি প্রশ্ন করলেন অর্জুন ভগবান তার উত্তর দিলেন — ১) স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি? ভগবান উত্তর দিলেন ৫৫নং শ্লোকে। ২) তিনি কিভাবে কথা বলেন? উত্তর ৫৬নং ও ৫৭নং শ্লোকে। ৩) তিনি কিভাবে অবস্থান করেন? উত্তর ৫৮নং ও ৫৯ নং শ্লোকে। ৪) তিনি কিভাবে বিচরণ করেন? উত্তর ৬৪নং - ৭১নং শ্লোকে। ৭২ নং শ্লোকে উপসংহার — জীবনের অন্তিম সময়ে যদি এই স্থিতিতে কোন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত হন, তিনি মৃত্যুর পর ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন।

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী ইসকন মায়াপুরে ১৯৯২ সালে যোগদান করেন। শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের চরণ কমলে আশ্রিত হয়ে প্রথম থেকেই তিনি গ্রন্থ প্রচারে যুক্ত আছেন। ২০১৭ সালে শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারীর গ্রন্থ প্রচারের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন করেন।

ভেজিটেবল চপ

উপকরণ ঃ আলু ৩টি। গাজর ৩টি। বীট বড়ো বড়ো ২টি। কড়াই শুঁটি ২৫০ গ্রাম। বীনস ১৫০ গ্রাম। ছোলা বা মটরের বেসন ১৫০ গ্রাম। কাজু ১০০ গ্রাম। কিসমিস ১০০ গ্রাম। বিস্কুট গুঁড়ো ১৫০ গ্রাম। ঘি ২৫০ গ্রাম। কাঁচা লংকা ৩টি। আদা ১ টুকরো বাটা। জিরা গুঁড়ো ১ চা-চামচ। চিনি ১ টেবিল চামচ। লবণ পরিমাণ মতো।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ আলু, গাজর, বীনস ছোট ছোট করে আমান্য করুন।

কড়াইতে সামান্য ঘি গরম করে কাজু ও কিসমিস আলাদা আলাদা করে ভেজে নিন। অল্প আঁচ থাকবে। সেই ঘিয়ের কড়াইতে গোটা জিরা ফোড়ন দিন। সবজীগুলো ওর মধ্যে ঢেলে দিন। পরিমাণ মতো লবণ দিন। ঢাকনা চাপা দিয়ে রান্না করুন। সবজীগুলো ভালো করে সেদ্ধ হয়ে যাবে। জল শুকিয়ে যাবে। চিনি দিন। ভাজা কাজু ও কিসমিস দিয়ে মিশিয়ে সবজি নামিয়ে নিন।

একটা পাত্রে বেসন নিয়ে জল ও অল্প লবণ দিয়ে মাখিয়ে নিন। বেসন মণ্ড বেশী ঘন হবে না। একটা থালাতে বিস্কুট গুঁড়ো ছড়িয়ে রাখুন।

এখন সবজীগুলো হাতে মুঠিতে করে লম্বা চপের আকার করে একটা থালায় সাজিয়ে রাখুন। একটি করে চপ নিয়ে বেসন গোলায় চুবিয়ে নিয়ে বিস্কুট গুঁড়োর ওপরে ভালো করে গড়িয়ে দিন।

এবার কড়াইতে ঘি গরম করুন। সব চপগুলো বিস্কুট গুঁড়োতে গড়ানো হলে তিন-চারটি করে চপ গরম ঘিয়ের মধ্যে লাল করে ভেজে তুলে নিন।

গরম অন্ন বা রুটির সাথে এই ভেজিটেবিল চপ একটা থালাতে সাজিয়ে নিয়ে শ্রীশ্রীরাধামাধবকে ভোগ নিবেদন করুন।

— সুলোচনা রাধা দেবী দাসী

সাঁতারু ইঁদুর ও লম্ফমান ব্যাঙ

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিক্ষামূলক কাহিনী হতে সংগৃহীত

একদা এক ব্যাঙ এবং এক ইঁদুর ছিল। ব্যাঙ একটি পুকুরে বাস করত এবং ইঁদুরটি মাটির মধ্যে এক গর্তে বাস করত।

তারা উভয়ের মিত্র ছিল। ব্যাঙ জল থেকে বাইরে আসত এবং ইঁদুর তার গর্ত থেকে বের হয়ে এসে মিলিত হয়ে অনেক গল্প করত।

যে মুহূর্তে কোন বিপদের সংকেত পেত, ব্যাঙ তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ত আর ইঁদুর গর্তে প্রবেশ করত।

একদিন ব্যাঙ ও ইঁদুর যখন পুকুর পাড়ে গল্প করছিল তখন তারা দেখল দুই বন্ধু একে অপরের হাত ধরে পরমানন্দে ঘোরাফেরা করছে।

এটি দেখে ইঁদুরের মাথায় বুদ্ধি এল এবং সে বলল ...

তখন ব্যাঙ তার পা বাড়িয়ে দিয়ে বলল ...

ইঁদুর তার লেজ শক্ত করে ব্যাঙের পায়ে বেঁধে দিল।

সেই সময় পুকুর পাড়ে বিকট শব্দ হলো। ভয়বশতঃ অভ্যাস অনুযায়ী ব্যাঙ জলে লাফ দিল। যেহেতু ইঁদুরের লেজ ব্যাঙের পায়ের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা ছিল, ব্যাঙের সঙ্গে ইঁদুরও ঠান্ডা জলে পতিত হলো।

ব্যাঙ জলে বাস করার সুবাদে জানত সাঁতার কিভাবে কাটতে হয় কিন্তু ডাঙাতে থাকার সুবাদে ইঁদুর জানত না সাঁতার কিভাবে কাটে। ব্যাঙ দ্রুত সাঁতার কেটে অগ্রসর হতে লাগল এবং ইঁদুর ক্রমশই ডুবতে লাগল।

কিছু সময় পরে ইঁদুরের মৃত্যু হলো। ব্যাঙ ইঁদুরকে ডাকতে লাগল।

কিন্তু ইঁদুর কোন উত্তর দিল না। ব্যাঙ তখন চিন্তান্বিত হলো।

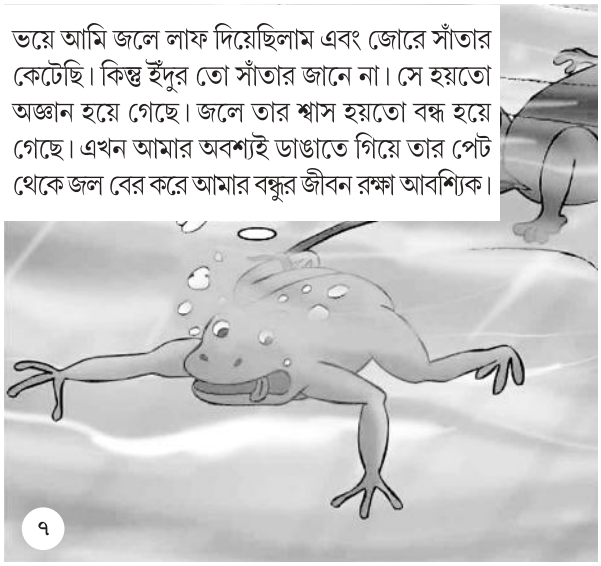

এই ভেবে সে পুকুর পাড়ে এল।

একটি ঈগল পাখি দীর্ঘক্ষণ গোল চক্কর দিচ্ছিল। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল সেই মৃত ইঁদুরটিকে। ত্বরিৎ গতিতে নীচে নেমে এসে মৃত ইঁদুরটিকে ধরে আবার উড়ে গেল।

যেহেতু ব্যাঙের পা ইঁদুরের লেজের সঙ্গে শক্তভাবে বাঁধা ছিল তাই ব্যাঙও দীর্ঘ সময় আকাশে ঘুরতে লাগল। কিছু সময় পর সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। সে যখন উপরে তাকালো দেখতে পেল ঈগল আর তার ঠোঁটে মৃত ইঁদুর।

তাৎপর্য ঃ অন্ধভাবে অনুসরণ চরম বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

মহাজন কথা

পুরীদাস দাস

নবম মহাজন হলেন ভীষ্মদেব। ইতোমধ্যে আমরা আটজন মহাজনের জীবন চরিত আলোচনা করেছি। তাঁদের মধ্যে নারদ, কুমার ও কপিলমুনি হলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী তথা বৈরাগী। অপর দিকে বাকিরা সবাই ছিলেন বিবাহিত গৃহস্থ। কিন্তু ভীষ্মদেব রাজপরিবারের মধ্যে অবস্থান করেও আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করেছিলেন। এইরূপ ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য তাকে 'ভীষ্ম' নামে অভিহিত করা হয়। এখনও পর্যন্ত আলোচিত অন্য সমস্ত মহাজনেরা ভগবানের ভক্তরূপেই প্রকট হয়েছিলেন কিন্তু ভক্ত কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য ভগবানের শত্রু হওয়ারও অভিনয় করতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে সেই ভক্তকে সারা জগতের সমালোচনা সহ্য করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও ভক্ত ভগবানের প্রীতিবিধানে অবিচল থাকেন। এইরকমই ভগবানের এক বিশেষ শুদ্ধ ভক্ত হচ্ছেন ভীষ্মদেব।

ভগবানের সঙ্গে ভীষ্মদেবের চিন্ময় রসের আদান প্রদান

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবান তাঁর দাস্যরসের ভক্ত ভীষ্মদেবের সঙ্গে যে আদান প্রদান করেছিলেন, তাতে বীর্যরসের সঞ্চার হয়েছিল। পঞ্চপাণ্ডবদের সংহার করার জন্য দুর্যোধনের কাছে রাখা ভীষ্মদেবের পাঁচটি বিশেষ বাণ অর্জুন কৌশলে দুর্যোধনের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিলেন যা ছিল প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের ছলনা। ভীষ্মদেব তা বুঝতে পেরে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, পরের দিন, কৃষ্ণকে অস্ত্রধারণ করতে হবে, নতুবা তাঁর সখা অর্জুনের মৃত্যু হবে। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি অস্ত্রধারণ করবেন না। পরের দিন ভীষ্ম এমন ভাবে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন যে, অর্জুন ও কৃষ্ণ উভয়েই অত্যন্ত সঙ্কটে পড়েছিলেন এবং তাঁদের দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়েছিল। অর্জুন প্রায় পরাজিত হয়েছিলেন এবং পরিস্থিতি এতটাই সঙ্কটজনক হয়েছিল যে, পরমুহূর্তেই অর্জুন ভীষ্মদেব কর্তৃক নিহত হতেন।

ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর প্রিয় ভক্ত ভীষ্মদেবের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে তাঁর প্রীতিবিধান করতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর অস্ত্রধারণ করার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, অর্জুনকে রক্ষা করার জন্য রথ থেকে নেমে এসেছিলেন এবং রথের চাকা তুলে নিয়ে সিংহের মতো ক্রোধান্বিতভাবে দ্রুতবেগে ভীষ্মদেবের প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন। ভীষ্মদেব তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রিয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হওয়ার জন্য তাঁর রথের উপর দাঁড়িয়েছিলেন। সেদিনকার মতো যুদ্ধ সেখানেই পরিসমাপ্ত হয়েছিল। এই লীলার মাধ্যমে ভগবান দেখিয়েছিলেন যে, তাঁর ভক্তের প্রতিজ্ঞা, তাঁর কাছে তাঁর নিজের প্রতিজ্ঞার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ।

ভীষ্মদেব যদি ভগবানের শত্রু হতেন, তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিনা প্রয়াসে তাঁকে হত্যা করতে পারতেন। তাঁকে

রক্তাক্ত ও আহত অবস্থায় ভীষ্মদেবের সম্মুখে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তিনি তা করেছিলেন কারণ শুদ্ধ ভক্ত কর্তৃক উৎপন্ন আঘাতের দ্বারা অলঙ্কৃত ভগবানের চিন্ময় সৌন্দর্য তাঁর যোদ্ধাভক্ত দর্শন করতে চেয়েছিলেন। এটিই হচ্ছে ভগবান এবং তাঁর সেবকের মধ্যে চিন্ময় রস বিনিময়ের পন্থা। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, ভীষ্মদেবের তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ভগবানের দেহ যে আহত হয়েছিল, তা ভগবানের কাছে সম্ভোগেচ্ছার প্রবল আবেগের ফলে প্রেমিকার দংশনের মতো আনন্দদায়ক। প্রেমিকার দ্বারা এই প্রকার দংশন শত্রুতার লক্ষণ বলে মনে হয় না, যদিও তার ফলে দেহ ক্ষত হয়। তাই ভগবান ও তাঁর শুদ্ধ ভক্ত ভীষ্মদেবের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল তা ছিল দিব্য আনন্দের আদান-প্রদান।

জন্মের কাহিনী

অনেক পূর্বে একবার, স্বর্গের দেবতা অষ্টবসুগণ, তাঁদের পত্নীদের সঙ্গে নিয়ে বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন। বসুদের মধ্যে অন্যতম এক বসু ছিলেন দ্যু। দ্যু তাঁর পত্নীর অনুরোধে বশিষ্ঠ মুনির দিব্য গাভী নন্দিনীকে চুরি করে বসেন। বশিষ্ঠ যোগবলে তাঁর প্রিয় গাভী নন্দিনীর চুরির কথা জানতে পারলে, তিনি অভিশাপ দেন যে, বসুদের মানুষরূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করতে হবে। অভিশাপের কথা শুনে বসুরা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে, অনুশোচনা পূর্বক নন্দিনীকে ফেরত দিয়ে বশিষ্ঠের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করলে, বশিষ্ঠ বলেন যে, তোমরা মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করলেও এক বৎসরের মধ্যেই পুনরায় স্বর্গে ফিরে আসবে। কিন্তু দ্যু-এর অপরাধ অধিক হওয়ায়, দ্যু-কে মানুষের সম্পূর্ণ জীবনকাল অতিবাহিত করেই ফেরত আসতে হবে। যদিও সে গুণবান, শক্তিমান ও বেদজ্ঞ পণ্ডিত হবে, কিন্তু তার কোন সন্তান হবে না এবং স্ত্রীসুখ থেকেও তাকে বঞ্চিত থাকতে হবে।

বসুদের অনুরোধে গঙ্গাদেবী তাঁদের মা হওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন কারণ বসুরা কোন সাধারণ নারীর গর্ভে প্রবেশ করতে আগ্রহী ছিলেন না। কিছুদিন পরে কুরুরাজ শান্তনু গঙ্গার তীরে ভ্রমণ করার সময় এক স্বর্গের দেবীর সাক্ষাৎ পান। তিনি ছিলেন গঙ্গাদেবী। গঙ্গাদেবীর স্বর্গীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে শান্তনু তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। গঙ্গাদেবী এক শর্ত রাখেন যে, শান্তনু কখনও তাঁর কোন ইচ্ছায় বা কাজে বাধা দিতে পারবেন না। বাধা দিলে তিনি তাঁকে ত্যাগ করে চলে যাবেন। এরপরে গঙ্গার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে শান্তনু জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন। গঙ্গাদেবী তাঁর সদ্য প্রসূত সন্তানদের গঙ্গাবক্ষে বিসর্জন করে দিতেন। শান্তনুর হৃদয় বিদরিত হলেও, গঙ্গাদেবীর শর্তের কথা মনে করে তিনি কিছু বলতে পারতেন না। এইভাবে পরপর সাতটি সন্তানকে গঙ্গাদেবী জন্মের পরেই গঙ্গাবক্ষে বিসর্জন দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন অষ্টম সন্তান জন্মগ্রহণ করল, শান্তনু আর সহ্য করতে পারেননি। শর্তের কথা মনে থাকা সত্ত্বেও তিনি গঙ্গাদেবীর এই আপাত নির্দয় ব্যবহারের প্রতিবাদ করেছিলেন। গঙ্গাদেবী তখন আর তাঁর শেষ পুত্রটিকে বিসর্জন দেননি। তিনি শান্তনুকে অষ্টবসুর বশিষ্ঠ মুনি কর্তৃক অভিশপ্ত হওয়ার কাহিনী উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে সতজন বসুকে গঙ্গাবক্ষে বিসর্জন দিয়ে তাদের শাপমুক্ত করেছেন, কিন্তু অষ্টম বসু দ্যু-এর অপরাধ ছিল সবচেয়ে বেশী, তাই সে সম্পূর্ণ মানুষের জীবন কালই জীবিত থাকবে।

এরপরে গঙ্গাদেবী তাঁদের কনিষ্ঠ পুত্রকে নিয়েই রাজা শান্তনুকে ত্যাগ করেছিলেন। তার বেশ কিছু বছর পর তাকে সমস্ত শাস্ত্রে ও সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র পরিচালনায় উত্তমরূপে প্রশিক্ষিত করার পর তাকে পুনরায় রাজা শান্তনুকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ততদিনে এই পুত্র দেবব্রত বলে পরিচিত হয়েছিল। এই কাহিনী থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারি কিভাবে দৈব নির্দেশনায় আমাদের পূর্বকৃত কর্মের ফলই আমাদের সামনে সুখ ও দুঃখরূপে উপস্থিত হয়। তাই, আমাদের জীবনে উদ্ভুত পরিস্থিতির জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমরাই দায়ী।

ভীষ্মদেবের জীবনকথা

দেবব্রতকে পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়ে রাজা শান্তনু তাঁকে যুবরাজের পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। এমন সময় একদিন তাঁর সঙ্গে সত্যবতী নাম্নী এক পরমা সুন্দরী কন্যার সাক্ষাৎ হয়, যিনি ছিলেন দাসরাজের (মৎসজীবী বর্গের এক প্রধান) কন্যা। তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে দাসরাজের কাছে গমন করলে দাসরাজা শান্তনুকে বলেন, শুধু মাত্র এই শর্তে তিনি সত্যবতীকে শান্তনুর হাতে সম্প্রদান করবেন যে, সত্যবতীর পুত্রই হস্তিনাপুরের রাজা হবেন। কিন্তু রাজা শান্তনু দেবব্রতের প্রতি এতই স্নেহপরায়ণ ছিলেন যে, তিনি দাসরাজার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

পরে, দেবব্রত লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর পিতা বিমর্ষ। তিনি যখন কারণ অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে, তাঁকে রাজা হিসাবে দেখার জন্যই, শান্তনু সত্যবতীকে বিবাহ করতে বিরত হয়েছেন। তখন, পিতার খুশির জন্য তিনি প্রতিজ্ঞা

করেন যে, তিনি কখনই হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আরোহণ করবেন না। শুধু তাই নয়, যাতে ভবিষ্যতে তাঁর পুত্র-পৌত্রেরাও সিংহাসন দাবী না করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে তিনি আরও প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি সারা জীবন অবিবাহিত থাকবেন। তাঁর এই প্রতিজ্ঞায় খুশী হয়ে, তাঁর পিতা শান্তনু তাঁকে 'ভীষ্ম' নামে অভিহিত করে, ইচ্ছামৃত্যুর বর প্রদান করেছিলেন।

সেই সময় থেকেই ভীষ্ম কুরু সিংহাসনকে রক্ষা করার ব্রত নিয়ে তাঁর সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর জীবন ছিল বিভিন্ন ঘটনার ঘনঘটায় পরিপূর্ণ। তা সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করা, এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। যাইহোক এই বর্ণময় জীবন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পরিসমাপ্ত হয়েছিল। সারাজীবন ধরে ভীষ্ম তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের দ্বারা আদর্শ আচরণের উদাহরণ স্থাপন করে গিয়েছেন। তা সত্ত্বেও কুরু রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময়, দ্রৌপদী কাতরভাবে প্রার্থনা করলেও ভীষ্ম কোন প্রতিবাদ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সেই সময় তিনি ধর্মের সূক্ষ্মবিচার করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। শুধু তাই নয়, পান্ডবদের অজ্ঞাতবাসের শেষে, দুর্যোধনের অন্নের দ্বারা পালিত হওয়ার কারণেও তাঁর রাজসিংহাসন প্রতিরক্ষার শপথের কারণে তিনি কৌরবপক্ষে, ধর্মের বিরুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। যদিও শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের প্রীতিবিধানের জন্যই কখনও কখনও ভগবানের শত্রুরূপে অভিনয় করেন, তা সত্ত্বেও এখান থেকে আমাদের শিক্ষনীয় এই যে, অসৎসঙ্গ অত্যন্ত প্রভাবশালী। দীর্ঘ সময় ধরে অসৎ ব্যক্তিদের সঙ্গ ও তাদের অন্ন ধর্মাত্মা ব্যক্তিদেরও প্রভাবিত করতে পারে। এই প্রসঙ্গে কোন কোন আচার্য বলেন যে, অসৎ সঙ্গের প্রভাবে যেটুকু জড় কলুষ ভীষ্মের মধ্যে এসেছিল, অর্জুনের বাণের দ্বারা শরশয্যায় শায়িত হবার সময় তা সর্বান্তকরণে নিষ্কাশিত হয়ে যায়। তাই শরশয্যায় শায়িত অবস্থায় যে উপদেশ ভীষ্মদেব দিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র।

ভগবান বলেছেন, 'মৃত্যুর সময় যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমারই ভাব প্রাপ্ত হন।' শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গে তাঁর শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্যে লিখেছেন — 'মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভীষ্মদেবের মতো মৃত্যুবরণ করা।'

মহাজন ভীষ্মদেব

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দশম দিনে ভীষ্মের পতন হলেও তিনি মৃত্যুবরণ করেন নি। শরশয্যায় শায়িত অবস্থায়, তিনি উত্তম সময় উত্তরায়ণের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পিতার কাছে তিনি বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি মৃত্যুবরণ করতে সক্ষম হবেন। মহান যোদ্ধার এই প্রয়াণ তৎকালীন সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল এবং তাঁরা সকলে ভীষ্মদেবের প্রতি তাঁদের প্রেম, শ্রদ্ধা ও স্নেহ প্রদর্শন করবার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পর্বত মুনি, নারদ মুনি, ধৌম্য, ব্যাসদেব, বৃহদশ্ব, ভরদ্বাজ, পরশুরাম ও তাঁর শিষ্যবর্গ, বশিষ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমদ, ত্রিত, অসিত, কক্ষীবান, গৌতম, অত্রি, কৌশিক এবং সুদর্শনের মতো মহান মুনি ঋষিবৃন্দ। সবশেষে মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর অন্য ভাইদের সঙ্গে ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব অবগত হওয়ার জন্য অত্যন্ত সুন্দর রথে আরোহণ করে ভীষ্মদেবের সমীপে উপস্থিত হয়েছিলেন।

মহাজন বা প্রকৃত শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ হচ্ছে, তাঁরা কোন অবস্থাতেই ভগবানকে বিস্মৃত হন না। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা সকলেই বিভিন্ন প্রকার দিব্য প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে ভগবানের মহিমা সম্পর্কে অবগত পান্ডবদেরকে দেখেই, ভীষ্মদেবের চোখে প্রীতি ও স্নেহের বশে ভাবোচ্ছাসের অশ্রু দেখা দিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'হে পান্ডবগণ, যদিও তোমরা অনেক কষ্ট ও অন্যায় সহ্য করেছ কিন্তু আমি মনে করি সবকিছুই অনিবার্য কালের প্রভাবে সংগঠিত হয়েছে। আর এই কাল পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং ভগবানের পরিকল্পনা মহান দার্শনিকেরাও জানতে পারেন না।' তারপর শ্রীকৃষ্ণকে নির্দেশ করে বলেছিলেন যে, 'সেই পরমেশ্বর ভগবান, যিনি নারায়ণেরও উৎস। তিনি এখন কৃষ্ণকুলের একজনের মতো আমাদের মধ্যে বিচরণ করছেন।'—

এষ চৈ ভগবান সাক্ষাদাদ্যো নারায়ণঃ পুমান্।
মোহয়ন্মায়য়া লোকং গূঢ়শ্চরতি বৃষ্ণিষু।।
(শ্রীমদ্ভাগবত ১।৯।১৮)

তারপর ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলেছিলেন যে, 'শিব, নারদ, কপিল মুনি আদি সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অতি নিগূঢ় মহিমারাশি সম্পর্কে অবগত। কিন্তু মোহের বশে তোমরা তাঁকে তোমাদের মাতুলপুত্র, অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী, মন্ত্রণাদাতা, দূত, হিতকারী, সারথি ইত্যাদি বলে মনে করছ। কিন্তু তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।'

এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের (১। ৯। ১৯) তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন — 'ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত ভক্তের দুঃখ পাপময় কার্যকলাপ জনিত দুঃখ দুর্দশা থেকে ভিন্ন। ভগবানের এই সমস্ত মহিমা সম্বন্ধে ব্রহ্মা, শিব, নারদ, কপিল, কুমার এবং ভীষ্ম আদি উল্লেখিত মহাজনেরা অবগত ছিলেন এবং তাঁদের করুণার প্রভাবেই তা আয়ত্ত করা যায়।'

যুধিষ্ঠির মহারাজকে ভীষ্মদেবের উপদেশ

তারপর মহারাজ যুধিষ্ঠির মহান ঋষিবর্গের সমক্ষে ভীষ্মদেবের কাছে ধর্ম বিষয়ক বিভিন্ন কর্তব্যকর্মাদির অত্যাবশ্যক নীতি নিয়মাদি সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে ভীষ্মদেব প্রথমে মানুষের জীবনের স্বভাব ও যোগ্যতা অনুসারে সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের সংজ্ঞা বিবৃত করেছিলেন। তারপর তিনি দুই শ্রেণী বিভাগের মাধ্যমে আসক্তির প্রতিরোধী ক্রিয়া এবং আসক্তির অন্তঃক্রিয়া বর্ণনা করেছিলেন। অতঃপর তিনি দানধর্ম, রাজধর্ম, মোক্ষধর্ম ইত্যাদির ব্যাখ্যা স্ত্রীলোক ও ভক্তদের কর্তব্যকর্মাদি ইতিহাস থেকে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সবশেষে তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের উপায়াদি বর্ণনা করেছিলেন এবং বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমের কর্তব্য কর্ম ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে উত্তরায়ণ এসে উপস্থিত হওয়ায়, তিনি তাঁর বাক্যরোধ করেছিলেন এবং সমস্ত বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে, তাঁর নয়ন সমক্ষে উপস্থিত দীপ্তিময় উজ্জ্বল পীত বসনধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর নির্নিমেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করতে শুরু করেছিলেন।

ভগবানের প্রতি অন্তিম প্রার্থনা

প্রার্থনার শুরুতেই ভীষ্মদেব তাঁর সমস্ত চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা সর্বতোরূপে অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে সর্বশক্তিমান ভগবানের চরণে নিযুক্ত করেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী বর্ণনা করে, সেই রূপ মাধুরীর প্রতি চিত্তে আসক্তি প্রার্থনা করেছিলেন। এখান থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারি ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা কখনও ভগবানকে দর্শন করে তৃপ্ত হন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের আসক্তি উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। তারপর ভীষ্মদেব তিনটি শ্লোকে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধরত ভগবানের রূপ ও লীলা স্মরণ করেছিলেন। সেই ভগবান যাঁর কেশরাশি আলুলায়িত, মুখমন্ডল অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলি ও স্বেদবিন্দু সমন্বিত এবং শরীরে তীক্ষ্ণ শরাঘাতের ক্ষত চিহ্নাদি প্রকটিত। তারপরে ভীষ্মদেব আরও বিশেষ ভাবে ভগবানের সেই দর্শন স্মরণ করেছিলেন, যখন ভগবান তাঁর নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, রথচক্র হাতে নিয়ে, রক্তাক্ত কলেবরে, প্রবল ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে বধ করবার জন্য সিংহের মতো তাঁর দিকে ধাবমান হয়েছিলেন।

সর্বশেষে ভীষ্মদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধুর বৃন্দাবন লীলা ও যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজসূয় যজ্ঞে সকলের থেকে তাঁর পূজা গ্রহণের লীলা স্মরণ করে তাঁর প্রার্থনা সমাপ্ত করেছিলেন এবং শেষে, তাঁর মন, বাক্য, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা তাঁর চেতনাকে পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আবিষ্ট করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। ভীষ্মদেব হচ্ছেন এমন একজন মহাজন যাঁর কাছ থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারি, কিভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়। কারণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৮। ৫) ভগবান বলেছেন —

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্তা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।।

অর্থাৎ, 'মৃত্যুর সময় যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমারই ভাব প্রাপ্ত হন। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।' শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গে তাঁর শ্রীমদ্ভাগবতের (১। ৯। ৪৩) তাৎপর্যে লিখেছেন — 'মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভীষ্মদেবের মতো মৃত্যুবরণ করা।'

শ্রীভাগবত-অষ্টকম্

শ্রীল রসিকানন্দদেব

শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দ-মধুপানন্যাভিলাষোজ্ঝিতান্
পূর্ণপ্রেমরসোৎসবোজ্জ্বলমনোবৃত্তিপ্রসন্নাননান্।
শশ্বৎকৃষ্ণকথামহামৃতপয়োরাশৌ মুদা খেলতো
বন্দে ভাগবতানিমাননুলবং মূর্দ্ধ্না নিপত্য ক্ষিতৌ।। ১।।

গোবিন্দ চরণ পদ্ম ভ্রমর অন্য দিকে নাহি যায়ে।
ইতর জিনিসে নাহি অভিলাষে পূর্ণ প্রেমরস চাহে।।
সে রস স্বাদিয়া আনন্দে মাতিয়া উজ্জ্বল করিয়া মন।
কৃষ্ণকথাসুধা সাগরে ভাসিয়া নিয়ত উৎ ফুল্ল হন।।
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ভাগবত গণে আমারে করুণা করো।
কৃষ্ণকথামৃত সিঞ্চিয়া আমার জীবন সার্থক করো।। ১।।

পাদাব্জেকৃত সৎকৃতাবপি চতুর্বর্গে ঘৃণাং কুর্বতো
দৃক্পাতেহপি গতব্যথান্ ব্রজপতিপ্রেমামৃতস্বাদকান্।
মন্নানানতিদুস্তরং ভবমহাপাথোনিধিং গোষ্পদং
বন্দে ভাগবতানিমাননুলবং মূর্দ্ধ্না নিপত্য ক্ষিতৌ।। ২।।

ধর্ম অর্থ কাম কিংবা মোক্ষ আসি যাঁদের চরণে লুটে।
দৃষ্টিপাত নাহি সেসব কিছুতে দৃষ্টি কৃষ্ণপ্রেম পুটে।।
ভব ক্লেশমুক্ত কৃষ্ণপ্রিয়জন রত রস আস্বাদনে।
অতীব দুস্তর সংসার সাগরে গোষ্পদ করি মানে।।
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ভাগবত গণে আমারে করুণা করো।
কৃষ্ণকথামৃত সিঞ্চিয়া আমার জীবন সার্থক করো।। ২।।

মৃগ্যাং ব্রহ্মভবাদিভির্ব্রজবধূনাথাঙ্ঘ্রি কঞ্জদ্বয়ীং
স্বাতন্ত্র্যাৎ প্রণয়োরুরজ্জুভিরহো বদ্ধা বলান্নির্ভরম্।
স্বচ্ছন্দং পিবতস্তদাসবরসং প্রস্যন্দমানং মুদা
বন্দে ভাগবতানিমাননুলবং মূর্দ্ধ্না নিপত্য ক্ষিতৌ।। ৩।।

গোপিকাগণের প্রাণনিধিধন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যাম।
ব্রহ্মা শিব যাঁর তপস্যা করিয়া পায় না চরণ ঠাম।।
স্নেহময়ী মাতা রজ্জুতে বাঁধিয়া তাঁহারে ধরিয়া আনে।
পীরিতি রশিতে শ্রীকৃষ্ণে বাঁধিয়া মত্ত সবে রস পানে।।
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ভাগবত গণে আমারে করুণা করো।
কৃষ্ণকথামৃত সিঞ্চিয়া আমার জীবন সার্থক করো।। ৩।।

বিশ্বেষাং হৃদয়োৎসবান্ স্বসুখদান্ মায়ামনুষ্যাকৃতীন্
কৃষ্ণেনাধ্যবতারিতান্ জনসমুদ্ধারায় পৃথ্বীতলে।
সংসারাব্ধি-বহিত্র-পাদকমলাংস্ত্রৈলোক্যভাগ্যোদয়ান্
বন্দে ভাগবতানিমাননুলবং মূর্দ্ধ্না নিপত্য ক্ষিতৌ।। ৪।।

শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ কৃপাবলম্বনে মনুষ্য আকার ধারী।
পাপীরে তারিতে হরির আদেশে পৃথিবীতে অবতারী।।
সংসার বারিধি উত্তরিতে পাদ তরী যে দিয়াছ তীরে।
স্থাবর জঙ্গমে অকুণ্ঠে সবারে পাঠাহ বৈকুণ্ঠ পুরে।।
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ভাগবত গণে আমারে করুণা করো।
কৃষ্ণকথামৃত সিঞ্চিয়া আমার জীবন সার্থক করো।। ৪।।

আলোকামৃতদানতো ভবমহাবন্ধং নৃণাং ছিন্দতঃ
স্পর্শাৎ পাদসরোজশৌচপয়সাং তাপত্রয়ং ভিন্দতঃ।
আলাপদ্ব্রজনাগরস্য পদয়োঃ প্রেমানমাতন্বতো
বন্দে ভাগবতানিমাননুলবং মূর্দ্ধ্না নিপত্য ক্ষিতৌ।। ৫।।

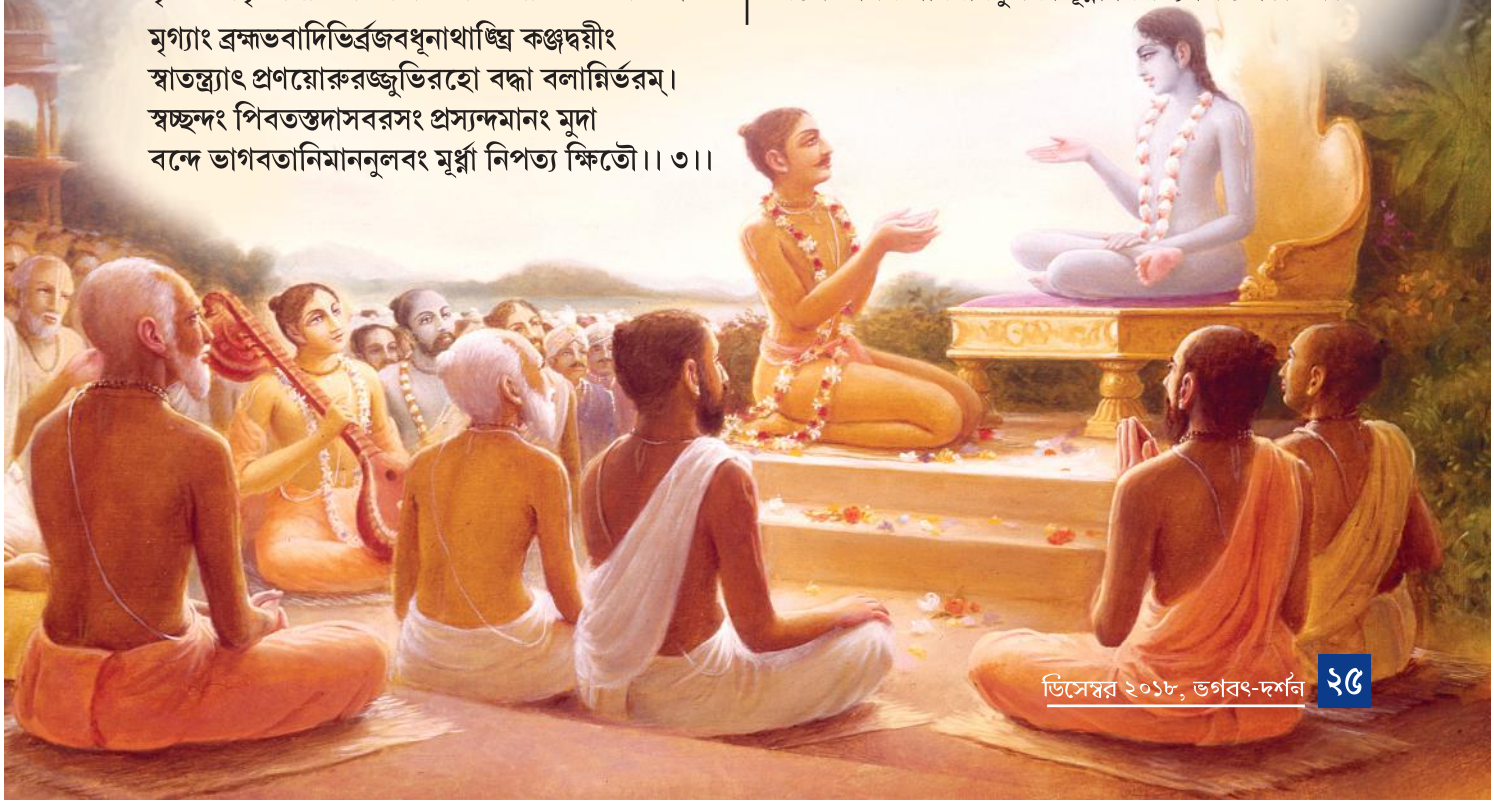

যাঁদের দর্শনে মর্ত্যের বন্ধন সহজে ছিঁড়িয়া যায়।
পাদধৌত জল পরশে জীবের ত্রিতাপ বিনাশ পায়।।
যাঁদের সহিতে আলাপ করিতে শ্রীকৃষ্ণ পীরিতি জাগে।
আসিয়াছে তাঁরা জনগণমাঝে অদভূত অনুরাগে।।
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ভাগবত গণে আমারে করুণা করো।
কৃষ্ণকথামৃত সিঞ্চিয়া আমার জীবন সার্থক করো।। ৫।।

ভাবাবেশ সমুজ্জ্বলান্ পুলকিনো হর্ষাশ্রুধারাবলী-
নির্ধৌতাননপঙ্কজান্নবনুবানন্দাদ্ ভৃশং নৃত্যতঃ।
প্রেমোচ্চৈশ্চয়িতং স গদ্‌গদপদং গোপীপতের্গায়তো
বন্দে ভাগবতানিমাননুলবং মূর্ধ্না নিপত্য ক্ষিতৌ।। ৬।।

প্রেমের আবেশে উদ্দীপিত রূপ রোমাঞ্চিত কলেবর।
হর্ষ-অশ্রুধারা প্রক্ষালিত মুখ গদগদ কণ্ঠস্বর।।
নব নব সুখে নর্তন করিয়া করে হরিসংকীর্তন।
গোপিকাবন্দিত শ্রীকৃষ্ণ চরিত গাহে সদা যুক্ত মন।।
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ভাগবতগণে আমারে করুণা করো।
কৃষ্ণকথামৃত সিঞ্চিয়া আমার জীবন সার্থক করো।। ৬।।

প্রেমাস্বাদপরায়ণান্ হরিপদস্ফূর্তিস্ফুরন্মানসান্
আনন্দৈকপয়োনিধীন্ রসসমুল্লাসিস্মিত শ্রীমুখান্।
ধন্যান্ সচ্চরিতৌঘনন্দিতজনান্ কারুণ্য পুরাশ্রয়ান্
বন্দে ভাগবতানিমাননুলবং মূর্ধ্না নিপত্য ক্ষিতৌ।। ৭।।

শ্রীকৃষ্ণ পীরিতি আস্বাদন যাঁর একমাত্র ব্রত হয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ স্ফূর্তিতে যাঁদের হৃদয় আলোকময়।।
যাঁদের বদন হরি অনুরাগে আনন্দ-উজ্জ্বল হয়।
তাঁদের করুণা দৃষ্টিতে জগত হয় যে আনন্দময়।।
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ভাগবতগণে আমারে করুণা করো।
কৃষ্ণকথামৃত সিঞ্চিয়া আমার জীবন সার্থক করো।। ৭।।

কৃষ্ণাদন্যমজানতঃ ক্ষণমপি স্বপ্নেঽপি বিশ্বেশ্বরে
তস্মিন্ ভক্তিমহৈতুকীং বিদধতো হৃৎকায়বাগ্‌ভিঃ সদা।
শ্রীলান্ সদ্‌গুনপুঞ্জকেলিনিলয়ান্ প্রেমাবতারানহং
বন্দে ভাগবতানিমাননুলবং মূর্ধ্না নিপত্য ক্ষিতৌ।। ৮।।

কৃষ্ণ ছাড়া কিছু মুহূর্ত কালেহ স্বপ্নেও জানে না আর।
কায়মনোবাক্যে ভক্তিমন্ত যাঁরা কৃষ্ণপ্রেম অবতার।।
ভজন পরাণ কৃষ্ণপ্রিয়জন নিষ্কাম ভকতিমান।
আসিয়া জগতে ভকতি শিখায়ে করে প্রেমরস দান।।
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ভাগবতগণে আমারে করুণা করো।
কৃষ্ণকথামৃত সিঞ্চিয়া আমার জীবন সার্থক করো।। ৮।।

এতদ্ভাগবতাষ্টকং পঠতি যঃ শ্রদ্ধান্বিতঃ ক্ষেমদং
ভক্ত্যুদ্রেক বিবর্ধনং প্রতিপদং প্রেম প্রমোদপ্রদম্।
প্রেমাণং পরমং ধ্রুবং স লভতে বৃন্দাবনেশাত্মসু
ক্ষিপ্রং ভাগবতেষু যেন বশগো গোপাঙ্গনাবল্লভঃ।। ৯।।

ভাগবতাষ্টক কৃষ্ণপাদপ্রদ ভকতি বর্ধনকারী।
প্রতি পদে পদে প্রেমার্পন করে পড়হ পীরিতি করি।।
বৃন্দাবনাধীশ হৃদয় রতন প্রিয় ভাগবতগণ।
গোপাঙ্গনাপতি প্রীতিলাভ করি তাতে বশীভূত হন।।
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ভাগবতগণে আমারে করুণা করো।
কৃষ্ণকথামৃত সিঞ্চিয়া আমার জীবন সার্থক করো।। ৯।।

অনুবাদ ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

ব্রজধাম দর্শন

সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

কাম্যবন

আদিবরাহ পুরাণে ভগবানের উক্তি —

চতুর্থং কাম্যকবনং বনানাং বনমুত্তমম্।
তত্র গত্বা নরো দেবি নম লোকে মহীয়তে।।

চতুর্থ বন কাম্যবন সমস্ত বনের মধ্যে উত্তম। হে দেবী, লোক সেই বনে গমন করলে আমার ধামে পূজ্য হয়ে থাকে।

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বলা হয়েছে —

সর্বকাম ফলপ্রদ কাম্যবন হয়।
যথা তথা কৈলে স্নান সর্বদুঃখ-ক্ষয়।।

এই কাম্যবনে সর্বকামনা সিদ্ধ হয়। এখানকার যে কোনও কুণ্ডে স্নান করলে সর্বদুঃখ নষ্ট হয়।

কাম্যবন কথাটি থেকে এখানকার শহরটির নাম কামা। ডীগ থেকে সড়কপথে কামার দুরত্ব ২২ কি.মি.। নন্দগ্রাম থেকে কামার দুরত্ব ১৪ কি.মি.। এই কাম্যবন রাজস্থান রাজ্যের ভরতপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত অত্যন্ত মনোরম মাহাত্ম্যপূর্ণ স্থান।

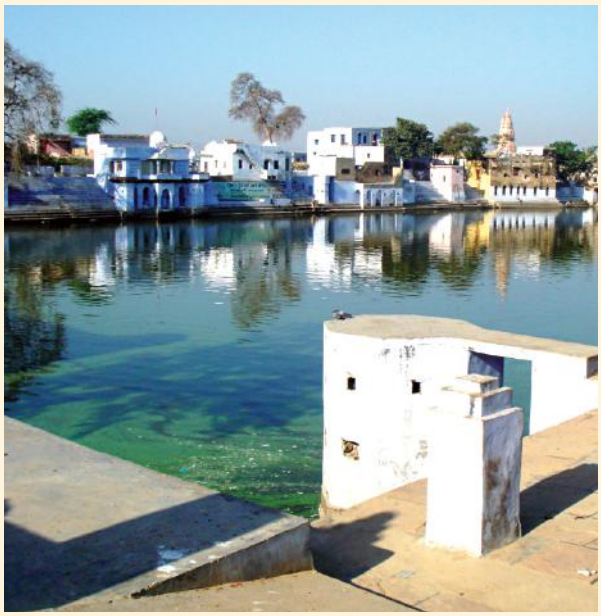

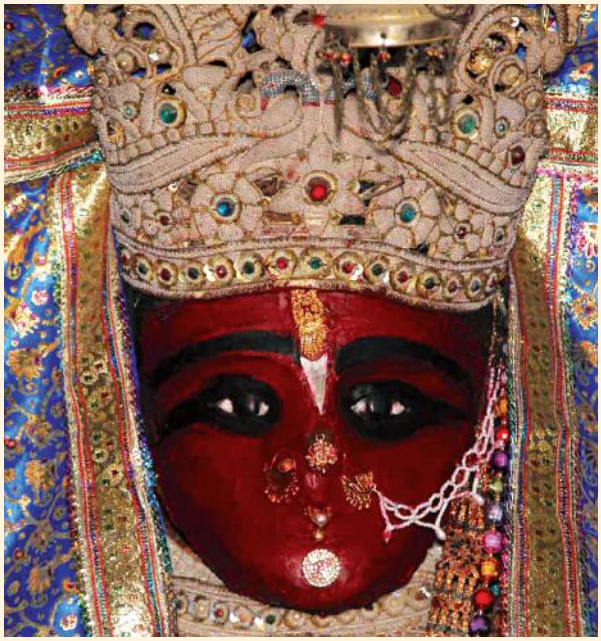

বৃন্দাদেবী — ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বৃন্দাবনের মন্দিরগুলি আক্রান্ত হলে শ্রীল রূপগোস্বামী সেবিত বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ, মধুপণ্ডিতের সেবিত বিগ্রহ শ্রীগোপীনাথ, সনাতন গোস্বামীর সেবিত বিগ্রহ শ্রীমদনমোহন এই কাম্যবনে স্থানান্তরিত হন। ভরতপুর কাম্যবনে তাঁদের জন্য তিনটি মন্দির মধ্যে পূজা অর্চনা চলছিল। গোবিন্দজীর মন্দিরের এক প্রকোষ্ঠে বৃন্দাদেবী আলাদাভাবে বিরাজিত হন। কয়েকদিন পর এখানেও বিপদের ছল উঠিয়ে জয়পুরে বিগ্রহগণ চলে যান। গোবিন্দ ও গোপীনাথ জয়পুরে আসেন। মদনমোহন আবার জয়পুর রাজকন্যার প্রেমে বশীভূত হয়ে করোলীতে চলে যান। কিন্তু কাম্যবনে বৃন্দাদেবীকেও সেবকগণ অন্যত্র নিয়ে যেতে চাইলে বৃন্দাদেবী আদেশ করেন, আমি ব্রজের বাইরে যাব না। এখানেই থাকবো। বলা হয় যে, গোবিন্দ বিগ্রহ এবং বৃন্দাদেবী বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ। তারপর এই বিগ্রহ বৃন্দাবনের ভূমিমধ্যে অদৃশ্য হলে পরবর্তীতে শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁদের আবিষ্কার ও সেবা যত্ন করেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বলা হয়েছে —

শ্রীরূপে শ্রীবৃন্দা স্বপ্নচ্ছলে জানাইল।
ব্রহ্মকুণ্ড-তট হৈতে তাঁরে প্রকাশিল।।
শ্রীবৃন্দাদেবীর শোভা মহিমা অপার।
সর্বকার্যসিদ্ধি হয়, হৈলে কৃপা তাঁর।।

সাধনদীপিকা গ্রন্থে বলা হয়েছে —

শ্রীবৃন্দায়াঃ পদাব্জং সুরমুনিসকলৈশ্চাপি ভক্ত্যানুবন্দ্যং
প্রেম্না সংসেব্যমানং কলিকলুষহরং সর্ববাঞ্ছাপ্রদঞ্চ।।

দেবতা ও মুনিগণ ভক্তিসহকারে সদা শ্রীবৃন্দাদেবীর চরণকমল বন্দনা করেন। প্রেমভক্তি সহকারে সেবিত হলে তিনি কলির কলুষ হরণ করেন এবং সমস্ত অভীষ্ট প্রদান করেন।

চুরাশি খাম্বা — বৃন্দাদেবীর মন্দির থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে। পঞ্চপাণ্ডবগণ বনবাসকালে এই কাম্যবনে থেকে ছিলেন। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা নির্মিত সভাগৃহের নিদর্শন রয়েছে। গৃহের চুরাশিটি স্তম্ভ বা খাম্বা রয়েছে। কৃষ্ণের উপবেশন সিংহাসন রয়েছে। এখনও বলা হয়, এই সভাগৃহের বৈশিষ্ট্য এই যে, যতবার গোনা হোক না কেন স্তম্ভ সংখ্যা গণনা ভিন্ন ভিন্ন হয়।

গয়াকুণ্ড — লুকলুকি কুণ্ড থেকে উত্তর পূর্ব দিকে করমকা সড়কের পাশে। পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান তর্পনাদির সুন্দর নিরিবিলি মাহাত্ম্যপূর্ণ স্থান।

রামেশ্বর সেতুবন্ধ — গয়াকুণ্ডের এক কি.মি. দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। এই স্থানে সখীদের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ উপবিষ্ট হলে বহু বানর লাফালাফি করতে লাগল। সখীরা বললেন, রামভক্ত বানরেরা এখানে কেন? কৃষ্ণ বললেন, আমিই রঘুপতি রাম। ললিতা সখী বললেন, রামচন্দ্র তো তাঁর ভক্ত বানরদের দিয়ে সমুদ্রের উপর পাথরের সেতু বেঁধে দিয়েছিলেন। তুমি কি তা পারবে? কৃষ্ণ তখন বললেন, তোমরা পাথর নিয়ে এসে এই সরোবরে ফেলো, ভাসে কি না দেখো। ললিতা সখী বললেন, আমরা কেন, বানরদের দিয়ে পাথর আনবো। রাধারানীর মুখের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণ বলেন, যদি রাধা আমার প্রাণ প্রিয়া হয়, তবে এই সরোবরে সেতু বাঁধতে পারব। এই বলে তিনি বানরদেরকে নির্দেশ দিলে বানরেরা পাথর নিয়ে সরোবরে ফেললে পাথরগুলি জলে ভাসতে লাগল। এই সরোবর লঙ্কাকুণ্ড নামে পরিচিত।

বিমলাকুণ্ড — কাম্যবনের সর্ববৃহৎ কুণ্ড। ভগবানের যোগমায়া শক্তি বিমলাদেবী এখানে সর্বদা বিরাজ করেন। সিন্ধু প্রদেশে চম্পকানগরীতে বিমল নামে ধর্মপ্রাণ রাজা বাস করতেন। তিনি ধনে, মানে, গুণে, বীরত্বে, ভগবদ্‌ভক্তিতে এক মূর্তিমান সুন্দর ব্যক্তিত্ব। তাঁর ছিল ষাট হাজার সুন্দরী ভার্যা। কিন্তু তারা বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হন। একদিন যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি রাজদরবারে এলে রাজা তাঁর বন্দনা করেন। ঋষি কুশল জিজ্ঞাসা করলে রাজা বলেন, আমি সন্তানহীন, তাই দুঃখী। হে ঋষিবর, আমার যাতে কোনও পুত্র হয়, তার উপায় বলুন। ঋষি ধ্যানস্থ হয়ে বললেন, রাজন্ এ জন্মে তোমার পুত্র হবে না। তবে কোটি কন্যা জন্মাবে। রাজা বললেন, পুত্রহীনের ইহকালে পরকালে কোন সুখ নেই। ঋষি বললেন, 'পুত্র না হলেও এক অপূর্ব সুন্দর জামাতা লাভ করবে, তাতেই তোমার সর্বাঙ্গীণ পরমানন্দ লাভ হবে। রাজা কৌতূহলী হয়ে বললেন, কবে কোথায় কোন্ কুলে তাঁর আবির্ভাব হবে? ঋষি বললেন, এই দ্বাপরের শেষভাগে, তোমার রাজত্বকালের একশো পনেরো বছর বাকী থাকতেই মথুরাতে যদুকুলে শ্রীবৎসাঙ্ক ঘনশ্যাম বনমালী পদ্মনেত্র চতুর্ভূজ সাক্ষাৎ হরি মাতা দেবকী ও পিতা বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবেন। তাঁর হাতে তোমার সমস্ত কন্যাকে অর্পন করবে। ততদিন পর্যন্ত তুমি বেঁচে থাকবে সন্দেহ নেই।'

তারপর বিমলরাজার কোটি সংখ্যক কন্যার জন্ম হয়। সুন্দরী শান্ত সুলক্ষণা কন্যাদেরকে বিবাহযোগ্য দেখে রাজা বিমল চিন্তিত হলেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির কথা স্মরণ করে একজন দূতকে পাত্র সন্ধানে মথুরাতে পাঠালেন। বললেন, তুমি যাও বসুদেব-ভবনে। সেখানে তাঁর পুত্রকে দেখো। যদি দেখো সুন্দর শ্রীবৎসাঙ্ক ঘনশ্যাম বনমালী চতুর্ভূজ হয়, তবে তাঁর হাতে কন্যাদের সম্প্রদান করব। বিমল রাজার নির্দেশে দূত মথুরা নগরীতে গিয়ে মথুরাবাসীদের কাছে সমস্ত অভিপ্রায় নিবেদন করল। সুবুদ্ধি মথুরাবাসীরা দূতের কাছে নিরিবিলি স্থানে মৃদুবাক্যে জানিয়ে দিল, আপনি দেবকী-বসুদেবের কথা, তাদের পুত্রের কথা কখনও বলবেন না। রাজা কংস তাদের সব কয়টা পুত্রকে হত্যা করেছে। শেষে একটা তাদের কন্যা জন্মেছিল, তাকে কংস মারতে গিয়ে যেই আছাড় দিল অমনি সে আকাশে উড়ে গিয়ে অদৃশ্য হলো। পুত্রহীন বসুদেব দুঃখিত অন্তরে এখানে বাস করছেন। সারা মথুরাবাসী কংসের ভয়ে ভীত। এই মথুরাতে বসুদেবের সন্তানবার্তা কেউ বললে কংস তাকে মেরে ফেলবে। তাই আপনি চুপচাপ এখান থেকে চলে যান।

তখন বিমলরাজার দূত মথুরা নগরবাসীর কাছে সেই কথা শুনে চম্পকাপুরী ফিরবার উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে মথুরা নগর থেকে বেরিয়ে বৃন্দাবনের যমুনার তীরে এসে পৌঁছাল। একটি লতাকুঞ্জের মধ্যে কিছু বালকদের মাঝখানে একটি বালককে দেখল। ঘনশ্যাম, শ্রীবৎসাঙ্ক, বনমালী, পদ্মনেত্র,

অত্যন্ত সুন্দর দেখতে। তার দিকে এগিয়ে গিয়ে দূত জিজ্ঞাসা করল, সোনা তোমার নাম কি? তোমার বাড়ি কোথায়? তোমার মা-বাবা কে? উত্তর এল, আমার নাম কৃষ্ণ, বাড়ি গোকুল, মা যশোদা, বাবা নন্দ মহারাজ।

দূত সেই মনোহর বালককে চিন্তা করতে করতে এসে বিমলরাজার কাছে বলেন, দেবকী-বসুদেবের সব সন্তানকে কংস মেরে ফেলেছে। কিন্তু পথমাঝে একটি বালককে দেখলাম, তার সব রকমের লক্ষণ ঠিক আছে, কেবল অমিল হচ্ছে চতুর্ভুজ নয় দ্বিভূজ, আর মা-বাবা অন্য। হে রাজন্, এখন আমার কি কর্তব্য? মুনিবাক্য মিথ্যা হয় না, তা বিশ্বাস করি। আপনি আমাকে যা করতে বলবেন, তাই আমি করবো। এভাবে দূতের মুখে মথুরার কথা শুনে বিমল রাজা বিস্ময়ান্বিত হলেন।

তারপর গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম হস্তিনাপুর থেকে এই সিন্ধুদেশ জয় করবার জন্য আসেন। বিমলরাজা তার সঙ্গে সন্ধি ও বন্ধুত্ব করলেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে ভীষ্মদেবকে বলেন, আপনি সাক্ষাৎ মহাভাগবত, আপনি অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানেন। আপনি আমাকে বলুন, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলেছিলেন মথুরার বসুদেবের পুত্ররূপে শ্রীহরি জন্মাবেন, তাঁর হাতে আমার সমস্ত কন্যাকে অর্পন করতে পারবো। কিন্তু সেই হরি বা কোথায়, আমার এখন কি করনীয়? ঋষিবাক্য তো মিথ্যা হবার নয়।

ভীষ্মদেব বললেন, হে রাজন্, ব্যাসদেবের মুখে যে গোপন কথা শুনেছি, তা মন দিয়ে শোনো। তা হলে আনন্দ পাবে। সেই শ্রীহরি বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মেছে। কংসের ভয়ে গভীর রাতে বসুদেব তার পুত্রকে নিয়ে কোনক্রমে গোকুলে এসে যশোদার শয্যায় রেখে যশোদার মায়া কন্যাকে নিয়ে মথুরায় বন্দীঘরে ফিরে এসেছিলেন। সেই পুত্রের নাম কৃষ্ণ। কৃষ্ণ গোকুলেই বড়ো হচ্ছেন। এগারো বছর এভাবে নন্দমহারাজের ঘরে থেকে কৃষ্ণ মথুরানগরীতে এসে কংসকে বধ করবে। এসব রহস্য আমি ব্যাসদেবের কাছ থেকে শুনেছি। শুধু কংসকেই নয় আরও অসংখ্য অসুরকেও বধ করবে।

হে রাজন্, এবার শোনো, সেই আনন্দের কথা। ভগবান রামচন্দ্রকে দেখে অযোধ্যার অসংখ্য কন্যা রামচন্দ্রকে পতিরূপে পাবার জন্য হৃদয়ে বাসনা করেছিল। সেই জীবনে তাদের বাসনা পূর্ণ হওয়ার সুযোগ হয় নি। কিন্তু কোটি কোটি কন্যা তাদের সেই আশা বাসনা সারাজীবন ধরে পোষণ করেছে। তারা অন্তর্যামী শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্বাদও পেয়েছে। অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র সেই কন্যাদেরকে মনে মনে বলেছেন তথাস্তু, তোমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হবে। হে রাজন্, সেই অযোধ্যাবাসিনীরা এজন্মে তোমার ভার্যাতে মনোজ্ঞা কন্যা রূপে জন্ম গ্রহণ করেছে। তোমার সমস্ত কন্যাকে সেই সর্বদেবতার আরাধ্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে নিঃসংশয়ে দান করো। বিলম্ব করো না।

ভীষ্মদেবের কথা শুনে সানন্দে বিমলরাজা সত্ত্বর দূতকে পাঠালেন শ্রীকৃষ্ণকে রাজদরবারে নিয়ে আসতে। সিন্ধুদেশ থেকে মথুরায় এসে দূত যমুনার তীরে তীরে বৃন্দাবনের দিকে বিচরণ করতে করতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন পেলেন। দূত মনোহর কৃষ্ণকে দেখে প্রণতি নিবেদন, প্রদক্ষিণ করে নির্জনে কৃষ্ণকে বললেন, হে ভগবান, নন্দমহারাজের কুল ধন্য, ব্রজধাম ধন্য আপনার আগমনে। আপনি সর্বজ্ঞ, সকলের কর্মের সাক্ষী, আপনি সকলের অন্তরের কথা সম্পূর্ণরূপেই জানেন। আমি বিমলরাজের দূতরূপে আপনার চরণপ্রান্তে আসবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। সিন্ধুপ্রদেশের চম্পকানগরীর রাজা বিমল আপনার পাদপদ্মে চিত্তবৃত্তি ন্যস্ত করেছেন। আপনার কৃপাদৃষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তিনি শতযজ্ঞ, প্রতিনিয়ত দান, তপস্যা, সাধুসন্তগণের সেবা, তীর্থভ্রমণ, আপনার নাম অবিরাম রূপে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে করে থাকেন। তাঁকে আপনার সুন্দর দর্শন দান করুন। তাঁর গুণবতী পদ্মনয়না কন্যাগণ আপনাকে পতিরূপে পাবার জন্য সর্বক্ষণ আপনার অন্বেষণ করে। আপনার জন্যই তারা বহু বারব্রত নিয়ম অবলম্বন করে থাকে। আপনি তাঁদেরকে দর্শন দিন। তাঁদের পাণিগ্রহন করুন। আপনি এটি কর্তব্য বিবেচনা করে সত্ত্বর গিয়ে সিন্ধুদেশ পবিত্র করুন।

দূতের সাথে শ্রীকৃষ্ণ চম্পকাপুরীতে উপস্থিত হলেন। বিমল রাজার পুরী মহাযজ্ঞের বেদধ্বনি উত্থিত হচ্ছিল। সহসা দূত সহ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে অবতীর্ণ হলেন। রাজা বিমল তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখে প্রেমবিহ্বল চিত্তে কৃতাঞ্জলি পুটে শ্রীকৃষ্ণের পদপ্রান্তে পতিত হলেন। রত্নখচিত স্বর্ণসিংহাসনে শ্রীকৃষ্ণকে বসিয়ে যথাবিধি পূজা ও স্তব করতে লাগলেন।

কৃষ্ণ বললেন, হে মহামতি, যাজ্ঞবল্ক্য বাক্যে আমার দর্শন পেয়েছ। এখন মনোগত বর প্রার্থনা করো। বিমলরাজা বর চাইলেন, হে ভগবান, আমার মন সর্বদা তোমার পাদপদ্মের ভ্রমরের মতো হয়ে বাস করুক, অন্য কোথাও বাসনা নেই।

তারপর শুরু হলো মহাধূমধামে বিবাহ অনুষ্ঠান। শ্রীকৃষ্ণের হাতে কন্যাসম্প্রদান করা হলে জনমণ্ডলে জয়ধ্বনি, গগনমণ্ডল থেকে দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন।

তারপর দিব্য বিমানে মনোরম রূপসম্পন্ন বিমলরাজা এবং তাঁর রানীরা সবার সমক্ষে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াগণকে নিয়ে কাম্যবনে এলেন। মনোরম কাম্যবনে প্রত্যেক প্রিয়ার সঙ্গে কৃষ্ণ তত সংখ্যক নিজেকে বিস্তার করে রাসনৃত্য করতে লাগলেন। সেই রাসনৃত্যে বিহ্বলচিত্তা বিমলকন্যাগণের নেত্র থেকে অনবরত আনন্দ বারিবিন্দু ক্ষরিত হতে লাগল। সেই প্রেমাশ্রুজলে এই কুণ্ড পরিপূর্ণ হলো।

বিমলাকুণ্ড দর্শন, কুণ্ডে স্নান, কুণ্ডের পূজা, জলপান করলে মেরুতুল্য পাপ ছেদন করে মানুষ গোলোকধামে গমন করে। বিমলাকুণ্ডের চতুর্দিকে বহু মন্দির ও অত্যন্ত মনোরম স্থান।

এই বিমলাকুণ্ড দর্শন, কুণ্ডে স্নান, কুণ্ডের পূজা, জলপান করলে মেরুতুল্য পাপ ছেদন করে মানুষ গোলোকধামে গমন করে। বিমলাকুণ্ডের চতুর্দিকে বহু মন্দির ও অত্যন্ত মনোরম স্থান।

যশোদা কুণ্ড — বিমলাকুণ্ডের এক কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। এই স্থানে মা যশোদা শিশু কৃষ্ণকে নিয়ে বাস করছিলেন। রাত্রে বাঘের গর্জন শুনে ভয় পেয়ে মা যশোদা ভগবতী মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন। তখন ভগবতী দেবী এসে যশোদা মাকে সান্ত্বনা দেন এবং নিশ্চিন্তে অবস্থান করতে বলেন।

ধর্মকুণ্ড — বিমলাকুণ্ডের দেড় কি.মি. উত্তর দিকে। এখানে তৃষ্ণার্ত বনবাসী পাণ্ডবেরা একে একে এসে জলপান করতে চাইলে বকরূপী ধর্মরাজ তাদেরকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তবে জলপান করো। নইলে মৃত্যু অনিবার্য। যুধিষ্ঠিরের চারভাই প্রশ্নকর্তার কথা অগ্রাহ্য করে জলপান করতে গেলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু শেষে যুধিষ্ঠির প্রশ্নকর্তার শত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। যথাযথ উত্তর পেয়ে বকরূপী ধর্মরাজ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর চারভাইকে পুনর্জীবিত করেন। শত প্রশ্নের মধ্যে শেষ চারটি প্রশ্ন হলো — আশ্চর্য কি? বার্তা কি? পথ কি? সুখী কে? উত্তর ছিল — যেকোনও প্রকারে মৃত্যু অবধারিত জেনেও মানুষ মনে করে আমি মরবো না, এটিই আশ্চর্য। পরমসত্য শ্রীকৃষ্ণ কথাই বার্তা। মহাজন নির্দেশিত ভগবদ্ভজন পদ্ধতিই পথ। অঋণী ও অপ্রবাসী ব্যক্তিই সুখী।

পঞ্চপাণ্ডব মন্দির — ধর্মকুণ্ডের পশ্চিম দিকে এই স্থানে বনবাসী পাণ্ডবেরা বাসকালে বহু শিষ্য সহ দুর্বাসা মুনি আতিথ্যগ্রহণের জন্য এসেছিলেন। দুর্বাসা মুনি যুধিষ্ঠিরকে বলেন, আমরা স্নান করে এসে এখানে ভোজন করবো। তাঁরা স্নান করতে গেলে পাণ্ডবেরা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। কারন, সূর্যদেবের দেওয়া থালিতে দ্রৌপদী বহু লোককে ভোজন করাতে পারতেন। দ্রৌপদীর ভোজনের পর সেদিন সেই থালিতে আর একজনকেও ভোজন করানো যাবে না। সেইদিন ইতিমধ্যে দ্রৌপদীর ভোজন হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা সবাই অগত্যা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েছিলেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ সেখানে ছিলেন না। কিন্তু ভক্তের আহ্বানে তিনি উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, আমাকে কিছু খেতে দাও। তখন রান্না করা পাত্রে লেগে থাকা এক কণা অন্ন খেয়ে শ্রীকৃষ্ণ বিশাল এক ঢেকুর তুললেন। তার ফলে নদীতে স্নানরত সহস্র মুনিসহ মহাতেজস্বী দুর্বাসাও ঢেকুর তুলতে লাগলেন। তাদের যেন আকণ্ঠ ভোজন হয়ে গেছে। তাই তারা পাণ্ডবদের গৃহে না এসে প্রস্থান করেছিলেন।

কামেশ্বর মহাদেব — পঞ্চপাণ্ডব মন্দিরের উত্তরপাশে কামেশ্বর মহাদেব বিরাজমান। বৃষভানু রাজা ও কীর্তিদামা সন্তান-কামনায় এই মহাদেবের পূজা করেছিলেন। পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ প্রতিষ্ঠিত এই কামেশ্বর শিব। শিবের স্থানে যে যা কামনা করে তার পূর্তি হয়। মঙ্গলপ্রার্থীগণ কামেশ্বরের কাছে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি ছাড়া অন্য কিছু প্রার্থনা করেন না।

নির্বিশেষ শূণ্যবাদী

ডঃ প্রেমাঞ্জন দাস

ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্রের চতুর্থ লাইনে বলা হয়েছে — 'নির্বিশেষ শূণ্যবাদী পাশ্চাত্য দেশ তারিণে'— অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদ নিরাকারবাদী, শূণ্যবাদী এবং পাশ্চাত্য দেশবাসিদের উদ্ধার বা ত্রাণ করেছেন। এই প্রবন্ধে আমরা নির্বিশেষবাদ এবং শূন্যবাদ কেন গ্রহণযোগ্য নয় তা আলোচনা করব।

১) নির্বিশেষবাদ কেন গ্রহণযোগ্য নয় — ক) নির্বিশেষ-বাদীদের মতে ভগবান নিরাকার। ভগবান যেহেতু পূর্ণ, তার মধ্যে কোনও কিছুর অভাব থাকতে পারে না। তাই ভগবানের মধ্যে আকারের অভাবও সম্ভব নয়। ভগবান হচ্ছেন অনন্তরূপ। অর্থাৎ তাঁর রূপের কোনও অন্ত নেই।

খ) নির্বিশেষবাদীরা মনে করেন ভগবানের মধ্যে কোনও বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু ভগবান হচ্ছেন পরম আনন্দময়। ইংরেজীতে বলা হয়, 'variety is the mother of enjoyment' অর্থাৎ বৈচিত্র্য হচ্ছে আনন্দ উপভোগের জননী। তাই আনন্দময় ভগবান স্বয়ং বিচিত্র, তাঁর শক্তি বিচিত্র এবং তাঁর সৃষ্টিও বিচিত্র। কেশব তুয়া জগৎ বিচিত্রা। হে কেশব, তোমার সৃষ্টি বিচিত্র। নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের এই বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে ভগবানকে আনন্দহীন বলে বর্ণনা করতে চান।

২) শূণ্যবাদ কেন গ্রহণযোগ্য নয়—ক) শূণ্য থেকে কোনও কিছুর সৃষ্টি সম্ভব নয়। একটি পরমাণু পর্যন্ত শূণ্য থেকে সৃষ্টি হতে পারে না। তাহলে পৃথিবী নামক গ্রহটি কি শূণ্য থেকে সৃষ্টি হল? কেউ কেউ বলেন, এই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে সূর্য থেকে। প্রশ্ন হল— সূর্য কি শূণ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে? অসম্ভব। তাই কেউ কেউ বলেন, সূর্য সৃষ্টি হয়েছে একটি শক্তিপুঞ্জ থেকে। প্রশ্ন হল সেই শক্তিপুঞ্জ কি শূণ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে? অসম্ভব। তাই কেউ কেউ বলেন, সেই শক্তিপুঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে বিগব্যাং নামক একটি জড় পিন্ড থেকে। প্রশ্ন হল — সেই বিগ ব্যাং কি শূণ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে? অসম্ভব। কেউ কেউ বলেন, ব্ল্যাক হোল থেকে সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সেই ব্ল্যাক হোল তো শূণ্য থেকে সৃষ্টি হতে পারে না। কেউ কেউ আবার বলেন যে, সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতি থেকে। কিন্তু প্রশ্ন হল, সেই প্রকৃতি কি শূণ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে? অসম্ভব।

অনেকে আবার বলেন যে, সেই প্রকৃতি আগে থেকেই ছিল। আগে থেকেই ছিল মানে এই প্রকৃতি শূণ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

পূর্ণতম সত্যকে বৈদিক শাস্ত্রে একজন ব্যক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে — যিনি হচ্ছেন ভগবান। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে সেই ব্যক্তিকে কৃষ্ণ নামে ব্যক্ত করা হয়েছে। কৃষ্ণ এক হয়েও অসীমরূপে নিজেকে বিস্তার করতে পারেন।

কিন্তু শূণ্য থেকে তো প্রকৃতির সৃষ্টি অসম্ভব। শূণ্যবাদীরা এই প্রশ্নের সমাধান করতে পারে না। তারা শুধু X সৃষ্টি হয়েছে Y থেকে, Y সৃষ্টি হয়েছে P থেকে, P সৃষ্টি হয়েছে Z থেকে— এইরকম চক্রাকারে এক অনন্ত চক্রে ঘুরতে থাকে। প্রকারান্তরে তারা শুধু বলতে চায় যে, সেই অনন্ত চক্রটি শূণ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে — যা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আজ পর্যন্ত শূণ্য থেকে কেউ কিছু সৃষ্টি করতে পারেনি।

খ) তাহলে সৃষ্টি কোথা থেকে হল? এজন্য আমাদের শূন্যের সম্পূর্ণ বিপরীত কোনও কিছুর অনুসন্ধান করতে হবে। সাদার বিপরীত কালো, আলোর বিপরীত অন্ধকার। ঠিক তেমনি শূণ্যের বিপরীত হচ্ছে পূর্ণ।

প্রশ্ন হল সেই পূর্ণ কোথা থেকে এল? মনে করুন, সেই পূর্ণ এসেছে, X থেকে। তাহলে পূর্ণের শেষ সীমা হচ্ছে X। তাহলে পূর্ণ আর পূর্ণ রইল না। পূর্ণ হচ্ছে এমন এক অসীম বৃত্ত, যার কোনও শেষ সীমা নেই। X,Y,Z — ইত্যাদি সবই হচ্ছে এক প্রকার ছোট ছোট বৃত্ত যেগুলি পূর্ণ নামক অসীম বৃত্তের ভেতরে অবস্থান করছে। আসলে অপূর্ণ জগতে আমরা এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, আমরা আমাদের ত্রুটিযুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে পূর্ণকেও অপূর্ণ বানাবার চেষ্টা করি। আসলে পূর্ণ হচ্ছে আমাদের অপূর্ণ মস্তিষ্কের কাছে এক অচিন্ত্য বিষয়। ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে ঃ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।

ভগবান পূর্ণ, ভগবানের সৃষ্টি পূর্ণ। এক পূর্ণ ভগবান থেকে অসংখ্য পূর্ণ প্রকাশিত হলেও সেই পরম পূর্ণ ভগবান কখনো অপূর্ণ হয়ে পড়েন না।

সেই পূর্ণতম সত্যকে বৈদিক শাস্ত্রে একজন ব্যক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে — যিনি হচ্ছেন ভগবান। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে সেই ব্যক্তিকে কৃষ্ণ নামে ব্যক্ত করা হয়েছে। কৃষ্ণ এক হয়েও অসীমরূপে নিজেকে বিস্তার করতে পারেন। রাসনাচের সময় একই কৃষ্ণ অসংখ্য গোপীর সঙ্গে অসংখ্য কৃষ্ণ রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। বৈদিকশাস্ত্র অনুসারে, ব্ল্যাক হোল নয়, একজন ব্ল্যাক পার্সন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই হলেন স্বয়ং ভগবান — কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। সেই শ্রীকৃষ্ণই হলেন জগতের বীজ। সমস্ত পূর্ণতা সেই বীজ -এর মধ্যে নিহিত আছে। শূন্যবাদের কোনও ভিত্তি নেই।